অন্নদাশঙ্কর রায়

আধুনিকতা

ডি. এম. লাইব্রেরী
কলকাতা

প্রথম সংস্করণ
চৈত্র ১৩৫৯

মূল্য দুই টাকা

ডি. এম. লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসত্যচরণ দাস কর্তৃক ১এ হরি পাল লেনস্থ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হয় এক হিসাবে রেনেসাঁসের সময় থেকে। আর এক হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্‌কাল থেকে। রুসো ভলতেয়ার ও গ্যয়টে এই হিসাবে যুগপ্রবর্তক। গ্যয়টের উপর লেখা প্রবন্ধ দুটি এই বইটির মূল সুর নির্দ্দেশ করছে। মূল সুর আধুনিকতা।

গ্যেটে এই বানানটি জার্মান মতে অশুদ্ধ। জার্মানদের উচ্চারণ বাংলা হরফে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। লেখা যেতে পারে গ্যয়টে, যদিও তা পুরোপুরি নির্ভুল নয়।

"রবীন্দ্রনাথ ও আমরা" একটি ভাষণ। "বাংলা সাহিত্যের গতি"ও তাই। প্রবন্ধের সঙ্গে এ দুটিও একনৌকায় যাত্রা করছে। পুনরুক্তিগুলো বাদ দিয়েছি। এক আধ জায়গায় জোড়াতালি না দিয়ে পারিনি। তা সত্ত্বেও এগুলি প্রবন্ধ হয়নি।

৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৫২ **অন্নদাশঙ্কর রায়**

সূচী

শ্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পূজনীয়াসু

কাবগুরু গ্যয়টে

ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে নব-ভাবের নব উদ্যমের নব নব প্রত্যাশার সাড়া পড়ে যায়। সে যুগের সাহিত্যকে সাধারণত রোমান্টিক বলে বিশেষিত করা হয়। কিন্তু ভোর হবার আগে যেমন পাখী ডাকে তেমনি ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্‌কাল হতেই কোনো কোনো দেশে রোমান্টিক সাহিত্যিকদের কল-কূজন সুরু হয়ে যায়। জার্মানীতে এঁদের পরিচয় ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিক বলে।

প্রথম যৌবনে "তরুণ ভের্টরের দুঃখ" লিখে গ্যয়টে যখন দেশ বিদেশে রাতারাতি বিখ্যাত হন তখন জার্মানীর ঝড়ঝাপটা যুগের বাণীমূর্তি বলেই তাঁর নাম করত সকলে। ইতিমধ্যে ও অতঃপর তিনি যেসব নাটক লেখেন তাতে তাঁর এ নাম পাকা হয়। কিন্তু সাফল্যের শিখরে উঠতে না উঠতেই তিনি স্বেচ্ছায় ও পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। তাঁর কাছে তাঁর পক্ষপাতী পাঠক ও সমধর্মা লেখকদের আশার অন্ত ছিল না। আশায় নিরাশ হয়ে তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝলেন ও দোষ দিলেন।

ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিকদের যিনি নেতা তিনি কি তবে তাঁর যুগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন? আপাতদৃষ্টিতে এ রকম মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ তিনি গেলেন ভাইমার নামক একটি সামন্ত রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে। সেখানকার অভিজাত মহলে তাঁর অবারিত দ্বার। তাঁদের সঙ্গেই তাঁর লীলাখেলা দহরম মহরম। লেখা তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না বড় একটা। বেরোয় যদি তো আগের মতো নয়। ক্বচিৎ এক-আধটা নিখুঁত কবিতা ঝরে পড়ে। ছাব্বিশ থেকে আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই তাঁর দশা।

বাইরে থেকে যা মনে হয় আসলে কিন্তু তা নয়। ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যও তো রোমান্টিক সাহিত্য। রোমান্টিক সাহিত্য বলতে যাই বোঝাক না কেন ওর ভিতরে এমন কিছু ছিল যা পাঠকদের অশান্ত করে তুলত। লেখককেও। সেই অশান্তি যে কিসের জন্যে তা যখন বিশ্লেষণ করতে বসি তখন নেতি নেতি করতে করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে কথার সঙ্গে কাজ চাই, নইলে কথা কেবল মুখের কথা। কাজ মানে বীরের মতো কাজ, বিদ্রোহ, বিপ্লব, সংঘাত, সংঘর্ষ। রোমান্টিক সাহিত্যের ভিতর য়্যাকশনের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। যার জীবনে য়্যাকশনের লেশমাত্র নেই সে রোমান্টিক সাহিত্যিক হয়ে দুদিন বীরপূজা পাবে। তার পরে তার বিজয়া দশমী।

দশমীতে বিসর্জনের জন্যে অপেক্ষা না করে নবমীতে অপসরণ শ্রেয়। গ্যয়টে সময় থাকতে সরে দাঁড়ালেন। তার পরে কী করবেন তা ভেবে মনঃস্থির করতে তাঁর দশ বারো বছর লাগল। একই মানুষ কবি হবে, বীর হবে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে

আছে কি না সন্দেহ। থাকলেও প্রথম শ্রেণীর নয়। রোমান্টিক কবিরা অধিকাংশ স্থলে নিভে যায়। যারা নিভতে চায় না তাদের বড় জ্বালার জীবন। তাদের বেলা দেখা যায়, হয় তারা কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কাজের লোক হয়ে উঠেছে, কাব্য ছেড়ে দিয়েছে, নয় তারা কথা বদলে দিয়েছে, রোমান্টিক ধারার বদলে ক্লাসিক। ক্লাসিক সাহিত্যিকদের কাছে কেউ বিদ্রোহ বিগ্রহ আশা করে না। আশা করে প্রশান্ত উপভোগ বা রূপভোগ। যারা স্বভাবত ক্লাসিক তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু যে বেচারা রোমান্টিক পন্থ ছেড়ে ক্লাসিক পন্থ ধরবে তার পক্ষে এ যেন মৃত্যু ও নব জন্মগ্রহণ। মাঝখানে দশ বারো বছর গর্ভযন্ত্রণা।

বয়স যখন আটত্রিশ গ্যয়টে পালিয়ে যান ইটালী। সেখানে বছর দেড়েক থেকে পুরোদস্তর ক্লাসিক দীক্ষা নেন। তার পরে যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর মুখে অন্য সুর। তখন তিনি বাণীমূর্তি আরেক যুগের। এ যুগ নয়া ক্লাসিক যুগ। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এর স্বতোবিরোধ ছিল। ঠিক সেই সময় শুরু হয় ফরাসী বিপ্লব। লোকে তখন ক্লাসিক চায় না। যার চাহিদা নেই তা লিখছেই বা ক'জন! একা গ্যয়টে এক হাতে কতটুকু করবেন! "এগমণ্ট", "তাসো" প্রভৃতি কয়েকটি পরীক্ষার পর তিনি বিজ্ঞানে মন দিলেন ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখে অন্য এক রাজ্যে জয়যাত্রা করলেন।

পরে শিলার তাঁর পরীক্ষার সাথী হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দুজনেই। গ্যয়টের "হেরমান ও ডরোথেয়া", শিলারের "ভিলহেলম টেল" দু'জনের দুই ক্লাসিক কীর্তি। কিন্তু ইউরোপের নানা দেশে তখন ফরাসী বিপ্লবের বান ডাকছে। বৃহত্তর জগতে যখন ঝড়ঝাপটা

চলছে মানসিক জগতে তখন শরতের প্রশান্তি কেমন করে স্থায়ী হবে! গ্যয়টে ক্লাসিকের দীক্ষা নিয়েও রোমান্টিকের আবর্ত থেকে উদ্ধার পেলেন না। শিলারের মৃত্যুর পর একাকী বোধ করলেন। একক চেষ্টায় শেষ করলেন "ফাউষ্ট" প্রথম ভাগ। ভাবলেন ক্লাসিক সাধনার পরাকাষ্ঠা হলো। কিন্তু হলো রোমান্টিক সাধনার বিলম্বিত ও বিমিশ্র পরাকাষ্ঠা।

ইতিপূর্বেই তাঁর "ভিলহেলম মাইষ্টারের শিক্ষানবীশী" শেষ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও ক্লাসিক ও রোমান্টিকের বিচিত্র মিশ্রণ। প্রধানত এই দু'খানি মহাগ্রন্থের উপর তাঁর দেশকালোত্তর যশ নির্ভর করছে। এ ছাড়া তাঁর বিভিন্ন বয়সের অগ্নিগর্ভ প্রণয়কবিতার উপর। প্রেমের দহন তাঁকে সারাজীবন দগ্‌ধেছে। ঈশ্বর তাঁকে এমন করে সৃষ্টি করেছিলেন যে প্রেমের অনুভূতি তাঁকে বার বার আগুনে পুড়িয়ে সোনার মানুষ করেছিল। সোনা হয়ে তিনি যাই লিখলেন তাই সোনা হয়ে গেল। নারী তাঁকে কোনদিনই বিপথে নেয়নি। প্রতিবারেই নিয়ে গেছে উর্ধ্ব হতে আরো উর্ধ্বে। বিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে যখন "ফাউষ্ট" দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হয় তখন তার শেষ কথা হলো—

"The Eternal Womanly draws us above."

নারী সম্পর্কে দান্তের পরে এত বড় প্রশস্তি আর কেউ রচনা করেননি।

যুগের সঙ্গে যোগাযোগ সেই ছাব্বিশ বছর বয়সের পর থেকে বেতালা হয়েছিল বলে গ্যয়টের কপালে ছিল নিরবচ্ছিন্ন ভুল বোঝা। উর্ধ্বচারী বলে শ্রদ্ধা করত তাঁকে সকলে, এমন কি শত্রুরাও।

কিন্তু ঠিক বুঝত না বেশী লোক। এখনো তাঁর প্রতি একটা বিমুখভাব রয়ে গেছে তাঁর দেশে ও বিদেশে। ঝড়ঝাপটার যুগ এখনো জগৎ জুড়ে চলছে। রোমান্টিক সাহিত্যই সাধারণের হৃদয় হরণ করে। কিন্তু যারা লেখে তারা বীর নয়, তাই নিজেরাও তৃপ্তি পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। যেভাবে গ্যয়টে তাঁর সমস্যার সমাধান করেছিলেন সেভাবে অর্থাৎ ক্লাসিক দীক্ষা নিয়ে সমাধান করতে পারছে ক'জন! সমাধানের জন্যে যাচ্ছে নীচে নেমে। করছে মনোরঞ্জন। সাহিত্য হয়ে উঠছে সিনেমার মতো এনটারটেনমেণ্ট। আর যারা ওভাবে সমাধান করতে অনিচ্ছুক তারা অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের মানসিক অস্বাস্থ্য তাদের দেহকে আক্রমণ করছে। এমনি করেই তো মারা গেলেন শেলী কীটস্ বায়রন। কেউ জলে ডুবে, কেউ যক্ষ্মায়, কেউ যুদ্ধের নাম করে। যারা মরে না তারা পাগল হয়ে যায়।

এ সব কথা যদি মনে রাখি তা হলে বুঝতে পারি গ্যয়টে কেন "কবিগুরু।" কাজী আব্দুল ওদুদ কেন তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন "কবিগুরু গ্যোটে।" ইচ্ছা করলে তিনি বলতে পারতেন, "মহাকবি গ্যোটে।" কিন্তু আজকের দিনের কবিদের কাছে মহাকবির চেয়ে কবিগুরুর তাৎপর্য বেশী। একালের কবিরা যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁকে তা হলে তাঁর আর কতটুকু লাভ হবে! লাভ হবে একালের কবিদের অনেক কিছু। তা বলে তাঁর অনুসরণ করা চলবে না। সম্ভব নয়ও। যুগের সঙ্গে তাল রাখার কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যর্থতা যেন কেউ নিজের ব্যর্থতার সমর্থনরূপে ব্যবহার না করেন।

কাজী সাহেবের এই গ্রন্থ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যে অপূর্ব। ইংরাজীতেও এমন জীবনীর সঙ্গে অনুবাদের সংযোজন বড় একটা চোখে পড়ে না। গ্যয়টের অনেকগুলি কবিতার তর্জমা আমি এই প্রথম পড়লুম, কেননা ইংরেজী তর্জমা কিনতে পাওয়া যায় না অনায়াসে। কাজী সাহেব স্বয়ং একজন প্রচ্ছন্ন কবি। সেইজন্যে তাঁর তর্জমা হয়েছে মৌলিকের মতো মধুর। তার উপর তিনি আজীবন গ্যয়টেপন্থী। গ্যয়টে তাঁর কাছে কেবল কবি নন, জীবনপথের দিশারী। গ্যয়টের বহু অমূল্য বাণী তিনি একত্র গ্রথিত করেছেন। এটিও এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। যাঁরা যেমন তেমন করে বাঁচতে চান না, কেমন করে বাঁচব এ যাদের প্রশ্ন, সেইসব জীবনজিজ্ঞাসুকে পড়তে হবে এ বই। নয় তো খুঁজতে হবে একারমানের সঙ্গে গ্যয়টের কথোপকথন নামক ইংরেজী বই।

কাজী সাহেব গ্যয়টেগৃহিণী ক্রিষ্টিয়ানাকে যথেষ্ট জায়গা দেন নি বলে তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। গৃহিণীকে পত্নীর মর্যাদা দিতে পনেরো বছর ধরে ইতস্তত করা কি উচিত হয়েছিল গ্যয়টের, এ কথা এই দেড়শো বছর অনেকের মনে উদয় হয়েছে। এর একটা নিষ্পত্তি চাই। নইলে লোকে চিরকাল তাঁকে ভুল বুঝবে। জীবনশিল্পীদের জীবনের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো অকারণ নয়। কারণ আছে নিশ্চয়ই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়। প্রথম যৌবনে কবি যাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর নাম ফ্রীডেরিকা। এঁর ভালোবাসাও তিনি পেয়েছিলেন। বিবাহের বয়স হয়েছিল, এমন কোনো বাধাবিঘ্ন ছিল না, সমান ঘর না হলেও যাজকের সম্মান সব দেশে।

কেন তবে তিনি ব্যথা বুকে চেপে বিদায় নিলেন? কারণ খ্রীষ্টীয় বিবাহে পাত্রপাত্রীকে অঙ্গীকার করতে হয়, সারাজীবন বিশ্বস্ত থাকব। গ্যয়টের পক্ষে এরূপ অঙ্গীকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতো। হয়তো তিনি বিশ্বস্ত থাকতেন জীবনের অবশিষ্ট ষাট বছর। কিন্তু যদি না পারতেন তা হলে কী হতো? তা হলে হতো অসত্যাচরণ। অথবা আপনার প্রতি অবিচার। চোখ বুজে অত বড় একটা অঙ্গীকার করা উচিত হতো না। সেই জন্যে তিনি বিবাহের প্রস্তাব না করে প্রস্থান করলেন। কয়েক বছর পরে লিলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। এমন সময় তিনি চললেন সুইজার-ল্যাণ্ড ও তার পরে ভাইমার। বাগ্‌দানের পরে লিলির পিতামাতার মত ছিল না বলে বাগ্‌দান ভঙ্গ করতেন কেন গ্যয়টে? তা নয়। খ্রীষ্টীয় বিবাহের ভিত্তিভূমি যে আজীবন বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকারের দ্বারা তিনি নিজেকে বাঁধতে পারলেন না। এমন যে গ্যয়টে তিনি ক্রিষ্টিয়ানাকে খ্রীষ্টীয় মতে বিবাহ করতেন কেমন করে? সিভিল ম্যারেজ তখনকার দিনে চলিত ছিল না। সম্পর্ক না পাতালেই পারতেন, কিন্তু ক্রিষ্টিয়ানার দিক থেকে বিবাহের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি জানতেন যে অভিজাতের সঙ্গে শ্রমিকের বিবাহ সেকালের সমাজ সহ্য করত না। যা হবার নয় তার চেয়ে যা হয়ে থাকে তাই ভালো। এই ভাবেই তাঁদের মিলন হয়। পরবর্তীকালে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে গ্যয়টে নিজের থেকেই ক্রিষ্টিয়ানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিধিবদ্ধ করে নেন। এবং রাজদরবারকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেন যে তাঁর পুত্র তাঁর আইনসঙ্গত বংশধর। এর পরে তাঁর ছেলের বড় ঘরে বিয়ে হয়। অভিজাত সমাজ তাকে মেনে

নেয়। প্রথম থেকেই গ্যয়টে ক্রিষ্টিয়ানার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। বিশ্বস্ত থাকতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। ক্রিষ্টিয়ানাও ছিলেন অসাধারণ পতিগতপ্রাণা। সুতরাং তাঁদের সম্পর্ক বিধাতার চোখে বিবাহই ছিল, মানুষের চোখে যাই হোক না কেন। আর একটি কথা, গ্যয়টে কোনো দিনই কোনো মানুষকে হীন জ্ঞান করেননি। কোনো শ্রেণীকেই তিনি নীচ শ্রেণী বলে ভাবতেন না। অভিজাত বলে তাঁর গর্ব ছিল না। তবে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন তা ঠিক। কাজী সাহেবের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি।

"নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে গ্যেটে চিরদিন মিশতেন, দয়াপরবশ হয়ে নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাদের তিনি ভাবতেন, 'ভগবানের সৃষ্টিতে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ—সংযম, সন্তোষ, ঋজুতা, বিশ্বাস, সামান্য সৌভাগ্যে উৎফুল্লতা, সরলতা, অনন্তকষ্টসহিষ্ণুতা, এই সমস্ত গুণ তাদের মধ্যে বর্তমান।' গ্যয়টের পুত্রবধূ লুইসের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে অত বড় জ্ঞানী সামান্য লোকদের সঙ্গে যে কী করে প্রাণভরে আলাপ করতেন তা তাঁর ধারণার অতীত।" (১৫৭ পৃষ্ঠা)

গ্যয়টের এই নিম্নশ্রেণীপ্রীতির সূচনা হয় বাল্যকালেই। তখন ভালোবাসতেন সত্যিকারের এক গ্রেট্‌খেনকে। সেই গ্রেট্‌খেনই বিবর্তিত হতে হতে হয়ে উঠল "ফাউষ্টে"র মার্গারেট বা গ্রেট্‌খেন। নিম্নশ্রেণীর এই বালিকাই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের মহীয়সী নায়িকারূপে কবির পরিণত বয়সের অন্তিম প্রশস্তির অধিকারিণী হয়েছে চিরস্মরণীয় আর্ষ বাক্যে—

"The Eternal Womanly draws us above."

(১৯৪৯)

গ্যয়টে ও তাঁর দেশকাল

গ্যয়টের বয়স যখন চল্লিশ তখন ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে—ফরাসী বিপ্লব। গ্যয়টের ব্যক্তিগত জীবনেরও একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনার জন্যে নয়, অথচ এর সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধও ছিল। সমষ্টির জীবনের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন নানা অদৃশ্য সূত্র দিয়ে বাঁধা।

ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে, যে ঘটনা ঘটবে তার ছায়া পড়ে তার পূর্বে। ফরাসী বিপ্লবের ছায়া কেবল ফ্রান্সে নয়, ফ্রান্সের বাইরেও পড়েছিল বেশ কিছু কাল আগে। জার্মানীতে এই ছায়া-পাতের যুগটাকে বলা হয় ঝড়ঝাপটার যুগ। এর নেতা ছিলেন আর কেউ নয়, গ্যয়টে স্বয়ং। তাঁর বাইশ-তেইশ বছর বয়সে লেখা 'গ্যোট্‌স' নাটক ও তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে লেখা 'ভের্টর' উপন্যাস জার্মানীতে যে ঝড়ঝাপটার সূচনা করে তা কেবল জার্মানীতেই আবদ্ধ থাকে না। ইউরোপের সর্বত্র 'ভের্টর'এর অনুবাদ হয়। তা পড়ে বহু যুবক আত্মহত্যা করে। তরুণের প্রাণে তখন এক অভূতপূর্ব অশান্তি। তার যেন কত কী করবার আছে, না করতে পারলে তার জীবন বৃথা, অথচ সময় অনুকূল নয়। সময়ের জন্যে

সবুর করতে হবে। সবুর করতে করতে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ অতিবাহিত হবে। তত দিনে বল বয়স চলে যাবে। কে করবে সবুর!

গ্যয়টে হয়তো এই জ্বালা থেকে মুক্ত হবার জন্যে আত্মহত্যা করতেন। কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করল তাঁর ভাগ্য। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভাইমারের সামন্তরাজার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। রাজ-কার্যের দায়িত্ব তাঁর অশান্ত অন্তরকে প্রশান্তি দিতে না পারলেও নিত্য নূতন প্রয়াসে ব্যাপৃত রাখল। তাঁর প্রয়াসের বিষয় ছিল কৃষি ও খনি। অন্য কোনো ভাগ্যবান হলে অবিলম্বে বিবাহ করতেন। উপযুক্ত গৃহলক্ষ্মীর অভাব ছিল না। কবি কিন্তু সে দিকে উদাসীন। থাকতেন একটি ছোট বাগানবাড়ীতে। ওটি যদি না পেতেন তা হলে মন্ত্রীপদ স্বীকার করতেন না, ভাইমার থেকে চলে যেতেন। ঐ তপোবনে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল তাঁর মালী ও একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন বিশ্বপ্রকৃতি। সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপের ভাষা হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান তাঁকে তন্ময় করে রাখল।

এইভাবে কেটে গেল দশ-এগারো বছর। বিপ্লবের ছায়া পড়ছে দেশে বিদেশে। ঝড়ঝাপটার যুগ সমানে চলেছে। লোকে আশা করছে গ্যয়টে থাকবেন যুগের পুরোভাগে। তিনি কিন্তু ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়লেন। তেমন লেখা আর তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না। দিন দিন তিনি নিজেকে সংযত ও অনাসক্ত করতে লাগলেন। অথচ সন্ন্যাসীর মতো নয়। ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল, মহাপুরুষদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মমতের উপর তাঁর আস্থা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের সমানধর্মা।

রুসো-ভলতেয়ারের সগোত্র। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি ইটালী যাত্রা করেন তখন তাঁর জীবন নানা বিপরীত শক্তির সংঘাতে দোলায়মান ও বিক্ষুব্ধ। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি ঝড়ঝাপটার যুগ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কোন্ খানে নোঙর ফেলবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। বিজ্ঞানসাধক হিসাবে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু বিজ্ঞান তো মানুষের সৌন্দর্যপিপাসা মেটাতে পারে না। সামাজিকতা তিনি পরিহার করেছেন, ভলতেয়ার ও রুসোর মতো তিনি অবন্ধন। কিন্তু এমন কোন্ পাখী আছে যার নীড় নেই, সঙ্গিনী নেই, সন্তান নেই? স্বাধীনতা ভালো, কিন্তু অতিমাত্র স্বাধীনতা ভালো নয়।

বছর দুই পরে যখন তিনি ইটালী থেকে ফেরেন তখন তাঁর সাহিত্যের আদর্শ স্থির হয়ে গেছে। ঝড়ঝাপটা এর পর থেকে তাঁর বাইরে। ভিতরে তার প্রবেশ নেই। জানালার খড়খড়ি ও সার্শী তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের মতো তাঁর সৌন্দর্যের আদর্শ ক্লাসিক। স্বদেশের ও স্বকালের রোমান্টিক আদর্শ তিনি পিছনে ফেলে এসেছেন। কিম্বা বলা যেতে পারে তিনিই পেছিয়ে যেতে যেতে প্রাচীন গ্রীস ও রোমে পৌঁছে গেছেন। আর কেউ অমন করে পিছু হটে নি। অথচ বিজ্ঞানে তিনি সবচেয়ে আধুনিক। তখনকার দিনে বিবর্তনবাদের উদয় হয় নি। গ্যয়টেই তার পূর্বদ্রষ্টা। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর দান সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর। কোনো বৈজ্ঞানিকের কোন মতবাদই চিরস্থায়ী হয় না, তাঁর বেলাও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

ইটালী থেকে ফিরে তিনি সঙ্গিনী গ্রহণ করলেন। শ্রেণীর বাধা ছিল বলে হোক বা ধর্মের প্রতি অনাস্থা ছিল বলে হোক বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটল না। হয়তো এ ক্ষেত্রেও তাঁর উপর রুসোর প্রভাব পড়েছিল। গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। গৃহ পেয়ে তিনি স্থিতি পেলেন। অথচ সামাজিক মানুষ হলেন না। সমাজ থেকে যেমন দূরে ছিলেন তেমনি দূরেই, বোধ হয় তার চেয়েও দূরে, রইলেন। ও দিকে ডিউক দিলেন তাঁকে রাজকীয় রঙ্গমঞ্চের পরিচালন ভার। থিয়েটার তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। এবার সুযোগ জুটল ইচ্ছামতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার।

এসব নিয়ে যখন তিনি সুশৃঙ্খল ও শান্ত তখন এলো কিনা ফরাসী বিপ্লব। আর পাঁচ-দশ বছর আগে আসতে কে বারণ করেছিল! এমন অকস্মাৎ আসবে বলে কেন নোটিস দিল না! দেখুন দেখি কী দারুণ অভদ্রতা! মানুষ একটু শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বাদ পাবে চল্লিশ বছর বয়সে, তাও বরাতে নেই। গ্যয়টে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করলেন। ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর আপত্তির প্রথম কথা হলো ওটা শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থী। ভুলে গেলেন যে জার্মানীর ঝড়ঝাপটাও আইন বাঁচিয়ে চলবে বলে অঙ্গীকার করে নি। মোট কথা, সবুর করতে পারবে না বলে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছিল। সবুর করতে করতে কেউ কেউ বোঝাপড়া করেছিল। অনেকের বেলায় সে বোঝাপড়া আপোসের পর্যায়ে পড়ে। গ্যয়টের বেলায় তা হয় নি। তাঁর জীবনযাত্রা আর দশজন অভিজাতের মতো ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ফিউডাল যুগের নয়। যেসব শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব তাদের চেয়ে তিনি নিকটতর ছিলেন যেসব

শক্তির অনুকূলে বিপ্লব, তাদের। তাঁর স্ত্রী জনগণের কন্যা, যেমন 'এগমণ্ট'এর ক্লারা। তাঁর প্রকৃতি-আরাধনা বিপ্লবী নায়কদের ধর্ম। তাঁর 'হেরমান ও ডরোথেয়া' নতুন ধরনের লোকসাহিত্য। বিপ্লবের পূর্বে রচিত ঝড়ঝাপটা যুগের নাটক উপন্যাস প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা। বিপ্লবের পরে রচিত 'স্বয়ংবৃত সম্পর্কাবলী' সামাজিক বিধিনিষেধের চেয়ে মানবমানবীর স্বাধীন সম্পর্ককেই বড় স্থান দিয়েছে। 'ফাউষ্ট' নাটকের জীবনদর্শন যে অক্লান্ত ও অনাসক্ত কর্মযোগ সে তা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও পুরাতন হয় নি।

ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী পঁচিশ বছর ইউরোপের জীবনে যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি দুঃখে দ্বন্দ্বে ভরা। যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা বিপর্যস্ত ইউরোপ কবিকে হয়তো পাগল করে তুলত, যদি না থাকত তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ও ক্লাসিক মার্গ। আপনাকে বাঁচাবার জন্যে তিনি একপ্রকার বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। সেটা এক হিসাবে ছাব্বিশ বছর বয়স থেকেই, কিন্তু বিশেষ করে চল্লিশের পর। নেপোলিয়নের পতন হলে যখন বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায় তখন গ্যয়টের জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় সারা হয়। তখন বাইরের জগতে শান্তি আসে, শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। জানালার সার্শী-খড়খড়ি বন্ধ করে রাখার দরকার থাকে না। পত্নীর সঙ্গে সম্বন্ধ ইতিমধ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কবির ঘরসংসারের ভার নেন উচ্চ-বংশীয়া পুত্রবধূ। বাগানবাড়ী থেকে ইতিপূর্বে উঠে আসা হয়েছিল বাসগৃহে। গ্যয়টের জীবনের অবশিষ্ট সতেরো বছর যে-কোনো একজন পদস্থ রাজপুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে

তুলনীয়। নানা দিগ্‌দেশ থেকে ভক্তেরা আসতেন তাঁর দর্শন পেতে। আরাম ও সম্ভ্রমের অভাব ছিল না। লোকে বলত, 'ইওর একসেলেন্সী'। পদবী মিলেছিল 'ফন গ্যয়টে'। এই বয়সেও তাঁর প্রকৃতিপূজার বিরাম ছিল না, তাঁর ক্লাসিক মার্গও ছিল অপরিত্যক্ত, কিন্তু একটু তফাত ছিল।

নেপোলিয়নের ফরাসী ফৌজ বার বার জার্মানী আক্রমণ করায় জার্মানদের জাতীয় ঐক্যবোধ নতুন করে উদ্দীপিত হয়। এ বোধ যে কোনো কালে ছিল না, তা নয়। বহু বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ও বোহেমিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় জার্মানীর রাজনৈতিক জীবনে ঐক্য ছিল না; কিন্তু সংস্কৃতিতে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে জার্মানমাত্রেরই একটা মিলনভূমি ছিল, যদিও সেখানেও প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকের ভেদবুদ্ধি ছিল। এবার রাজনৈতিক জীবনকেও এক সূত্রে বাঁধবার প্রয়োজন দেখা দিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাজনৈতিক ঐক্যের দরুন দিগ্বিজয়ী হয়েছে, ভূমণ্ডলের সর্বত্র রাজ্যলাভ করেছে, অর্থে ও সামর্থ্যে তারা অগ্রগণ্য। জার্মানী তাদের চেয়ে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও সব বিষয়ে পশ্চাৎপদ শুধু রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে। জার্মানী যদি এক রাষ্ট্র হতো, জার্মানরা যদি এক নেশন হতো তা হলে কি নেপোলিয়নের হাতে বার বার লাঞ্ছিত ও পরাজিত হতো?

এমনি করে ন্যাশনালিজমের সূত্রপাত হয়। সারা শতাব্দী ধরে এর মরসুম চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমরা এর পরিণাম দেখেছি। ন্যাশ-নালিজমের সঙ্গে তথাকথিত সোশ্যালিজম মিলিত হয়ে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারও পরিণাম লক্ষ্য করেছি। গ্যয়টে

গোড়া থেকেই এর বিরোধী ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, ফরাসীদের প্রাণকেন্দ্র প্যারিস, ইংরেজদের লণ্ডন। জার্মানদের প্রাণকেন্দ্র কিন্তু ভিয়েনা নয়, বার্লিন নয়—জার্মানীর প্রাণ বহু-কেন্দ্রিক। ফ্রাঙ্কফোর্ট, লাইপৎসিগ, মিউনিক প্রভৃতিও ভিয়েনা-বার্লিনের মতো প্রাণবন্ত। জার্মানীর মতো দেশকে ইংলণ্ডের মতো নেশন করতে গেলে তার সভ্যতার মূলসূত্রটি হারিয়ে যাবে। প্রাণধারার ঐক্যই আসল ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য তা নয়। গ্যয়টের কথা যদি তাঁর দেশ মনে রাখত তা হলে তার আজ এ দশা হতো না। কিন্তু তখনকার দিনের জার্মানরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে গালমন্দ দিয়েছিল, তার পরেও তাঁকে ঠিক বোঝে নি, এখনো ভুল বোঝে। তিনি তাঁর দেশকে, তাঁর জাতিকে কারো চেয়ে কম ভালোবাসতেন না; কিন্তু তাঁর নেশনবিরোধিতার কদর্থ করা হলো এই বলে যে তিনি বিশ্বপ্রেমিক, তাই আর সকলের মঙ্গল চান, স্বদেশের চান না। তিনি নেপোলিয়নের ভক্ত, তাই স্বদেশের বিপদে সাড়া দেন না, ছেলেকে যুদ্ধে পাঠান না। তিনি ফরাসী জাতির গুণমুগ্ধ, জার্মান জাতির নিন্দা ছাড়া প্রশংসা করেন না। অর্থাৎ তিনি পোয়েট, কিন্তু পেট্রিয়ট নন।

গ্যয়টের শেষজীবন তাই অবিমিশ্রি শান্তিময় ছিল না। শিলারকে তাঁর দেশবাসী মাথায় তুলে নিয়েছিল। শিলারের জনপ্রিয়তার একাংশও গ্যয়টের ভাগ্যে জোটে নি। তিনি জানতেন যে তাঁর লেখা সকলের জন্যে নয়। সকলে যেদিন বুঝবে সেদিন অবশ্য সকলের হবে, তার দেরি আছে। সেইজন্যে জনপ্রিয়তার প্রত্যাশা রাখেন নি। কিন্তু যশ তিনি আজীবন পেয়েছিলেন। স্বদেশে বিদেশে—

সব দেশে। নেপোলিয়ন তাঁকে দেখে বলেছিলেন, একটা মানুষ বটে। দিগ্বিজয়ী তাঁর 'ভের্টর' পড়েছিলেন সাত বার। যুদ্ধযাত্রার সময় যেসব বই নেপোলিয়নের সঙ্গে যেত 'ভের্টর' তার একটি।

গ্যয়টের মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর উপর কেটে গেছে। এখনো তিনি জনপ্রিয় হতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর যশ তাঁকে অলিম্পস পর্বতের গ্রীক দেবতাদের সঙ্গে আসন দিয়েছে। আর-কোনো জার্মান সাহিত্যিক এ সম্মান লাভ করেন নি। দান্তে ও শেক্স্‌পীয়ারের পরবর্তী ও টলষ্টয়ের পূর্ববর্তী আর-কোন ইউরোপীয় সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য নন। ইউরোপের বাইরে একালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর তুল্য। হাজার বছরে সারা পৃথিবীতে যে পাঁচ জন অমর সাহিত্যিক অবতীর্ণ হয়েছেন গ্যয়টে তাঁদের মধ্যমণি। মধ্যম পাণ্ডবের মতো তিনি সব্যসাচী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'ফাউষ্ট', শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ভিল্‌হেল্‌ম মাইষ্টার' ও অজস্র প্রেমের কবিতা বিশ্বসাহিত্যে চিরস্মরণীয়।

কিন্তু তাঁকে যে অলিম্পিয়ান বলা হয় এ শুধু তাঁর সাহিত্য-সাধনার জন্যে নয়। এ তাঁর জীবনদর্শনের জন্যেও। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন বাহির থেকে, ভিতর থেকে, উপর থেকে, তল থেকে। দেখেছিলেন মানুষের চোখে, প্রকৃতির চোখে, দেবতার চোখে। তন্নতন্ন করে দেখেছিলেন, নেতি নেতি করে দেখেছিলেন। যেটি যেখানকার সেটিকে সেখানে রেখে দেখেছিলেন, তার আশে-পাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন, সমগ্রের মধ্যে স্থাপন করে দেখেছিলেন। দৃষ্টির তপস্যা তাঁর মতো আর কেউ করেন নি সর্বতোভাবে। গাছ পাতা ফুল প্রজাপতি হাড় দাঁত কঙ্কাল করোটি

গ্রহ তারা মেঘ বাষ্প রং রেখা রূপ স্পর্শ কিছুই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে ছিল না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নারীর সঙ্গে নরের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এমনি কত রকম সম্পর্ক তাঁর দৃষ্টির বিষয় ছিল। তাঁর ধ্যানের বিষয় ছিল অন্তহীন প্রগতি, যার মূলে অবিরাম পরিশ্রম পরীক্ষা ও পরিত্যাগ। কোনো কিছুতে আসক্ত হয়ে থাকলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তা সে যতই পুরাতন, যতই পরিচিত, যতই প্রিয় হোক। মনে হবে হৃদয়হীনতা, আসলে বেদনার পর বেদনার অভিজ্ঞতা।

আজ কি তাঁকে আমাদের দরকার আছে, এই উন্মত্ত পৃথিবীতে? প্রগতির পথ ধরে ধ্বংসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা সভ্য মানব। বিজ্ঞান আমাদের বন্ধু নয়, যেমন ফাউষ্টের বন্ধু নয় মেফিষ্টোফেলিস। গ্যয়টে পাঠ করে কী আমাদের সান্ত্বনা?

এর উত্তর নানা পাঠক নানা ভাবে দেবেন। একজন পাঠক হিসাবে আমার উত্তর দিই। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের মতো রুশ বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায় এখন চলছে। এ অধ্যায় কবে শেষ হবে, কে হারবে, কে জিতবে, গ্যয়টের মতো আমাদেরও অজানা। তাঁর দৃষ্টান্ত যদি অনুসরণ করি তা হলে বাইরের শত অশান্তি সত্ত্বে আমরা প্রকৃতিস্থ থাকব, আত্মস্থ থাকব, ধ্যানস্থ থাকব। এ অধ্যায় এক দিন শেষ হবেই। তত দিন যদি বেঁচে থাকি তা হলে বাইরেও শান্তি আসবে। যত দিন বেঁচে আছি তত দিন সাধ্যমতো বাইরের শান্তির জন্যেও চেষ্টা করব। গ্যয়টের হৃদয়ে জাতিপ্রেম ছিল; কিন্তু জাতিভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর

জন্ম উচ্চ শ্রেণীতে, কিন্তু বিবাহ নিম্ন শ্রেণীতে। স্বয়ং অভিজাত হয়েও জনগণের সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য। মানুষে মানুষে হিংসা দ্বেষ এক দিনের জন্যেও তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। না ব্যক্তিগত জীবনে, না সমষ্টিগত জীবনে। বহু অত্যাচার তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে। তার দরুন তিনি বেদনাবোধ করেছেন। কিন্তু মানুষকে তার জন্যে ঘৃণা করেন নি। হিংসার বদলে হিংসার কথা ভাবেন নি। তাঁর মতো আমাদের অন্তঃকরণ নির্মল হোক, নির্বিষ হোক। তাঁর স্বাস্থ্য যেন আমরাও পাই। মত্ততার যুগে তিনি ছিলেন অপ্রমত্ত। আমরাও যেন থাকি।

অপ্রমাদের জন্যে তাঁকে করতে হয়েছিল এক হাতে বিজ্ঞানচর্চা, আরেক হাতে ক্লাসিকচর্চা। একসঙ্গে প্রকৃতির আরাধনা তথা শাশ্বত সৌন্দর্যের উপাসনা। এই দুই ডিসিপ্লিন এখনো আমাদের পরম প্রশান্তি প্রদান করতে পারে। তা হলেও আধুনিক সাহিত্যিকের চিত্ত সান্ত্বনা মানে না। দিনের পর দিন যে প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুলেছে সে প্রশ্ন কি গ্যয়টের মতো অলিম্পিয়ানকেও আকুল করে নি? আমরা কি কেবল নীরব সাক্ষীর মতো দেখে যাব, পরে সাক্ষ্য দেব? আমরা কি কোনো অবস্থায় হস্তক্ষেপ করব না, কণ্ঠক্ষেপ করব না? এই নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতা কি পুরুষোচিত? এ কি অমানুষিক নয়?

গ্যয়টের কাছে এর উত্তর আশা করা বৃথা। তার জন্যে যেতে হবে টলষ্টয়ের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে।

(১৯৫০)

———

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা

ইটালীয় তেরজা রিমা ছন্দে রচিত "কৈফিয়ৎ" কবিতায় প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবি হওয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"যৌবনে বাসনা ছিল, দুনিয়ার ছবি
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে,—
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি।
ফলাতে সঙ্কল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে,
আকাশের নীল আর অরুণের লাল,—
এ দুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে।
দলিত অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিল না বেশী অন্তরের ঘটে—
এ কবি ছিল না কভু বাণীর দুলাল।
তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে।
হেথায় হয় না কভু গুরুর আকাল।
পড়িনু কত-না-জানি বিজ্ঞান দর্শন,

ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল।
সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ।
বন্ধ হল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে
গড়িনু জ্ঞানেতে-ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে।
নেত্রপথে এসে দুটি সুবর্ণ বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক ছেয়ে—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়।
বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি,—
এ সত্য সহজে বোঝে দুনিয়ার মেয়ে।
ফল কথা, কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর।
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি।
পূজাপাঠ ছেড়ে তাই বাঁধিয়া কোমর,
সমাজের কর্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,—
সুরু হল সেই হতে সংসার-সমর।
পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিল না স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ।
কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,

স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, জানে হৃষীকেশ।
কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে।
এদিকে রূপালি হল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হল আত্মার আলোক,—
হইল মনের দফা প্রায়শ নিকেশ।
দেখিলাম হতে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক।
এসব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,
না জানি কখন আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর।
হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান।
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।"

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা এই দ্বিতীয় যৌবনের কবিতা। এই দ্বিতীয় যৌবনও তাঁর দীর্ঘ দিন ছিল না। বোধ হয় সাত আট বছরের বেশী নয়। তার পরে তাঁর হাতে আর কবিতা হয় নি। কেন হয় নি তার কৈফিয়ৎ তিনি দিয়ে গেছেন ইতস্তত ছড়ানো ভাবে। "কবিতা লেখা" নামে তাঁর একটি কবিতা আছে, সেটি তাঁর দ্বিতীয় কৈফিয়তের কাজ করবে।

"এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা
কবিরা পায় না নিজের দেখা।
ঢাকা চাপা দিয়ে মনটি রাখি,
নিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাঁকি।
গলা চেপে গায় প্রেমের গান,
ভয়ে ভয়ে ছাড়ে প্রাণের তান।
ভাব-মদে হলে নয়ন লাল,
দশে মিলে দেয় দুচোখো গাল।
সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ী
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ি।
কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে করে গৃহিণী-ব্রত।
বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে।"

এই কথাটি আর একটু স্পষ্ট হয়েছে "প্রেমের খেয়াল" কবিতায়।

"প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখি নি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখি নি তান।
কত না শুনেছি প্রণয় কাহিনী
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহি নি
কাঁপানো গান।"

বস্তুত বয়স হলে মানুষ নিজেই নিজের গলা চেপে ধরে সুরুচি সুনীতির ভয়ে। সমাজ তো চেপে ধরেই। সেইজন্যে প্রথম যৌবনেই সুরুচি সুনীতির শাসন উপেক্ষা করে গলা ছেড়ে গাইতে হয় "কাঁপানো গান"। যাঁরা প্রথম যৌবনে ও-কাজ করেন নি তাঁরা দ্বিতীয় যৌবনে পারেন না। যদি কেউ পারেন তো তিনি ব্যতিক্রম। আমাদের কবি গলা চেপে গাইতে গিয়ে দেখলেন সে যেন সোনার খাঁচার পাখীর গান। এতে তাঁর আন্তরিক আপত্তি। ঐ কবিতায় আছে—

"প্রেমের খেয়াল সহজে মানে না
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম মানে না
ফুলের বান।
প্রেম নাহি মানে আচার বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখীর গান।
প্রেম জানে নাকো দুবেলা মিছার
করিতে ভান।"

দুবেলা মিছার ভান করার চেয়ে না লেখাই ভালো। বোধ হয় সেই কারণে তাঁর প্রেমের কবিতা আপনা আপনি থেমে গেল। এই প্রসঙ্গে "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয়কে লেখা তাঁর "পত্র" কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

কল্পনা কম্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে।

ভোঁতা হল পঞ্চ বাণ, প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।
সমাজের পোষা পাখী, সমাজ খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে।”

আবার সেই সমাজের কথাই উঠল। সমাজের উপর কবি-মাত্রেরই অভিমান থাকে। এই কবিরও ছিল। এবং কিছু বেশী পরিমাণেই ছিল। সেইজন্যে তিনি সমাজকে সবুজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সমাজকে সবুজ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার ও গল্পলেখক-রূপে আপনাকে আবিষ্কার করলেন। নিজের যা শ্রেষ্ঠ তার সন্ধান পেলেন। কবিতা লেখা আর হল না। অথচ ক্ষমতা ও পাথেয় তাঁর ছিল।

ক্ষমতা যে ছিল তার প্রমাণ উপরের উদ্ধৃতিগুলি। ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন বলে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল সনেট। অথচ সনেটও তিনি ষাট সত্তরটির বেশী লেখেন নি, অন্তত ছাপেন নি। পঞ্চাশটি সনেট নিয়ে “সনেট পঞ্চাশৎ”। আরো কয়েকটি সনেট, তেরজা রিমা, তেপাটি বা ট্রায়োলেট, পয়ার, ত্রিপদী, ছড়া প্রভৃতি নিয়ে “পদচারণ”। দ্বিতীয় পুস্তিকাটি আকারে বড় না হলেও প্রকারে বিচিত্র। চেষ্টা করলে এই কবি বিভিন্ন রূপকর্মে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করতেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টার ক্ষেত্র হল চলতি ভাষায় গদ্য এবং সাধনার লক্ষ্য হল ছোট গল্প ও প্রবন্ধ। তাই তিনি ক্ষমতার নমুনা দিয়েই পদ্যরচনায় ক্ষান্তি দিলেন। হয়তো তাঁর মনের কোণে এমন কোনো চিন্তা ছিল যে, কবিতা আমি যতই লিখি না কেন রবীন্দ্রনাথের তুলনায়

মাইনর পোয়েট হয়ে থাকতে হবে। ছোটগল্পে ও প্রবন্ধে আমি মেজর। সুতরাং ছোটগল্প ও প্রবন্ধই আমার ক্ষমতার ক্ষেত্র।

কিন্তু সনেট লিখেই তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন আমার এ অনুমান অযথা নয়। "কৈফিয়ৎ" কবিতাটির শেষাংশ উদ্ধার করা যাক—

"এদিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,
বর্ণ সুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।
আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।
এ হাতে মুরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে কিন্তু পাকা পদ্য,—
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ"।
অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ।"

পাথেয় তাঁর ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় "চার ইয়ারী কথা"। প্রেমের উপলব্ধি রসের উপলব্ধি তাঁর জীবনে ঘটেছিল, এবং সাংসারিক জীবনের অকৃতকার্যতাকে মধুর করেছিল। এর চিহ্ন রয়ে গেছে এখানে ওখানে এক একটি টুকরায়। যেমন,—

"নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—

হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার। —ভুল

ক্ষমতা ছিল, পাথেয় ছিল, অথচ কোনোটির সম্যক্ ব্যবহার হল না, কাব্যসাধনা অর্ধপথেই থেমে গেল। মন চলে গেল ছোটগল্পের রাজ্যে, প্রবন্ধের রণক্ষেত্রে। হয়তো ভালোই হল। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির চেয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারের, প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখকের মর্যাদা বেশী। তিনি তাঁর নিজের পথ নির্ভুলভাবে বেছে নিয়েছিলেন। কার জীবন কেমন করে সার্থক হয় গোড়ার দিকে সে নিজেই তা জানে না, আঁধারে ঢিল ছোঁড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রও তো প্রথম বয়সে কবিতা লিখতেন। অভ্যাস রাখলে হেম-নবীনকে অতিক্রম করতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে হেরে যেতেন। কবিতায় ক্ষান্তি দিয়ে বঙ্কিম ভুল করেন নি, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পর রবীন্দ্রনাথেরও উপন্যাস রচনায় উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। পীড়াপীড়ি না করলে তিনি "যোগাযোগ" আরম্ভ করতেন কি না সন্দেহ। আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষ করতে বল পেলেন না। এই রকমই হয়। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, প্রমথ চৌধুরীর কবিতা কেন তাঁর প্রবন্ধ ও গল্পের তুলনায় নিষ্প্রভ, এর যথার্থ উত্তর—গল্প ও প্রবন্ধ তার প্রভা হরণ করেছে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের। অথচ কে একথা অস্বীকার করবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রতিভা উচ্চকোটির ছিল! বন্দেমাতরম্ তার সাক্ষী।

তেমন সাক্ষী প্রমথ চৌধুরীরও আছে। যদিও তেমন প্রসিদ্ধ নয়, প্রসিদ্ধ হবার যোগ্যতা রাখে না। উদ্ধৃতির প্রলোভন সংবরণ করতে পারছি না বলে একটিমাত্র দিচ্ছি। এটি যে তাঁর শ্রেষ্ঠ

সনেট তা নয়। হতে পারে এটি তাঁর বিশিষ্ট সনেট। আর কারো হাতে এমনটি হত না।

"কখনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমন্তের রাত্রিহেন থাকে গো জড়িয়ে,
—যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ॥
বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারাণো বর্ণ, লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জ্বেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ॥
কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিঃশ্বাস।
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস॥
বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী,
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবাগাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন কামিনী॥" —রূপক

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা কি টিকবে? বলা যায় না। কবিতার ইতিহাসে দেখা যায় মহাকাব্যের ভরাডুবি ঘটছে, ভেসে থাকছে ছড়া কিম্বা পদাবলী জাতীয় খণ্ড কবিতা। তিনি যাকে বলতেন চুট্‌কি। টলষ্টয় ছিলেন চুট্‌কির পক্ষপাতী। সব যাবে, চুট্‌কি থাকবে, কেননা মানুষের পক্ষে চুট্‌কি তৈরী করা যেমন সহজ মনে রাখাও তেমনই। মানুষের মন যাকে রাখে সেই থাকে। চুট্‌কির উপর আমাদের কবির কতখানি ভরসা ছিল তার প্রমাণ নীচে দিলুম—

"আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত,
অন্তরে সঞ্চিত করি আঁধার আলোক,
প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক।" —বিশ্বরূপ

এটা সংস্কৃতকবিদেরও উচ্চাভিলাষ ছিল।

"আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার,
চুটকিতে রাখি সব আশা ভালবাসা।
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার,—
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা ভাসা।" —গজল

এটি এপিটাফের কাজ করে।

পরিশেষে, আর একটি প্রশ্ন। তাঁর কবিতার উপর কার কার প্রভাব পড়েছে? আমার উত্তর—ইটালীয় কবি পেত্রার্কার, পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের, ভারতীয় কবি ভাসের, বঙ্গীয় কবি ভারত-চন্দ্রের। "কৈফিয়ৎ" কবিতায় রবিপূজার কথা আছে। কিন্তু ওটা যেন দক্ষিণমেরুর উপর উত্তরমেরুর প্রভাব। বিপরীতের উপর বিপরীতের।

(১৯৪৭)

প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি

কিছুকাল থেকে লক্ষ করছি চিঠির পর চিঠি আসছে আমার কাছে। আসছে একজনের কাছ থেকে নয়। বিভিন্ন স্থল থেকে। পত্রলেখকদের ধারণা প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমার গুরু, আমি তাঁর শিষ্য, তাঁর উত্তরসাধক। এঁদের কেউ বা জানতে চান তাঁর জীবনকাহিনী, কেউ বা তাঁর জীবনদর্শন। এঁদের বিশ্বাস আমি তাঁর জীবনেরও সন্ধান রাখি।

তাঁর সম্বন্ধে এই যে জিজ্ঞাসা এটা সুলক্ষণ। ইউরোপ হলে এত দিনে তাঁর মতো উচ্চ কোটির লেখকের পাঁচ সাতখানা জীবন-চরিত লেখা হয়ে যেত। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের এ দেশে জীবনচরিতের বাজার মন্দা। বিশেষত আজকাল। বোধ হয় সেই কারণে এক ভদ্রলোক চৌধুরী মহাশয়ের জীবনী লিখবেন বলে স্বেচ্ছায় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর কাছ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে আর অগ্রসর হতে পারছেন না। উপরে যে সুলক্ষণের কথা বলেছি সেটা যদি তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় তা হলে তিনি হয়তো সক্রিয় হবেন ও বহুজনের জিজ্ঞাসার উত্তর দেবেন। যত দিন না চৌধুরী মহাশয়ের পুরোমাপের জীবনচরিত

লেখা হচ্ছে তত দিন আমাদের একমাত্র ভরসা তাঁর স্বলিখিত "আত্মকথা।" স্বলিখিত? না, স্বকল্পিত। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর হাত কাঁপত, তাঁর সহধর্মিণী তাঁর বক্তব্য লিখে নিতেন। একটানা নয়, প্রতি দিন একটুখানি করে। "আত্মকথা"র কতক অংশ এখনো অপ্রকাশিত। প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। কয়েক পৃষ্ঠা খোয়া গেছে বলে চৌধুরানী মহাশয়া ইতস্তত করছেন। তাঁর অসীম আফশোস। আমাদেরও। যদি কোনো শখের ডিটেকটিভ ঐ পৃষ্ঠাগুলি উদ্ধার করার ভার নিতে উদ্যত হন তবে এখনো আশা আছে। তাতে নাকি সেকালের বিলেতের বৃত্তান্ত ছিল। চৌধুরী মহাশয়ের চোখে দেখা বিলেতের।

এখন আমার নিজের কথা বলি। আমি লোকটা গুরুবাদী নই। বরং গুরুবাদবিরোধী। গুরু যদি আমার কেউ থাকেন তবে তাঁদের সংখ্যা এক বা দুই নয়, জীবনের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন নারী ও পুরুষের কাছে আমি বিভিন্ন সংকেত পেয়েছি। তাঁদের অনেকের নাম সাধারণের অজানা। জানিয়ে কাজ নেই। যাঁদের সকলে চেনে তেমন কয়েকজনের নাম বাঙালীর মধ্যে চণ্ডিদাস, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী। ভারতীয়ের মধ্যে গান্ধীজী। মানবজাতীয়ের মধ্যে টলষ্টয়, রম্যা রলাঁ, এলেন কেই, গ্যয়টে, চেখভ। আমি যদি উত্তরসাধক হয়ে থাকি তবে শুধু একজনের কেন? আর আমার একার কি কোনো সাধনা থাকতে নেই? যা একান্তই আমার? যারা দু'দিন পরে জন্মেছে তারা কি একজনের না একজনের উত্তরসাধক হতেই জেন্মেছে? কাল যখন অনাদি ও অনন্ত তখন একদল বসন্তের ফুলকে আরেক দল বসন্তের ফুলের উত্তরসাধক বা উত্তরসূরী বলে নামাঙ্কিত করা ভুল।

তা হলেও আমি স্বীকার করি যে টলষ্টয় যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গেছেন বা যে কাজে ফাঁক রেখে গেছেন সে কাজ আমার উপরেও বর্তেছে। তেমনি রবীন্দ্রনাথ যে কাজ সারা করে যেতে পারলেন না, যে কাজে হাত দিতেঁ সময় পেলেন না, সে কাজ আমার উপরেও পড়েছে। তেমনি প্রমথ চৌধুরী যে কাজে বাধা পেলেন, যে কাজে ভঙ্গ দিলেন সে কাজ আমার উপরেও চেপেছে। আমি পালাতে চাইলেও পালাতে দিচ্ছে কে? স্বভাবত আমি পলাতক। কিন্তু কর্তব্য থেকে পালিয়ে কেউ কখনো সুখী হয় নি।

এর মানে এ নয় যে আমি এসব কাজ পারব। খুব সম্ভব পারব না। কিন্তু সেই না পারাটা সমসাময়িকদের বা পরবর্তীদের পারার সোপান হবে। যে সৈনিক লড়তে লড়তে পড়ে যায় সেও আর দশজনকে এগোবার পথ করে দেয়। তার শরীরের উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। পারব কি পারব না এটা একটা প্রশ্নই নয়। হাত দেব কি দেব না এইটেই প্রশ্ন। এর উত্তর, হাঁ, হাত দেব। তবে এক সঙ্গে নয়। এক এক করে। এক জীবনে যতটা হয় তার বেশী হওয়াতে গেলে হবে কেন?

এখন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাজটা কী ছিল ভেবে দেখা যাক। এই সেদিন বিশ্বভারতী থেকে তাঁর "প্রবন্ধসংগ্রহ : প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হয়েছে। তার পরে বই হয়ে বেরিয়েছে তাঁর একদা সহকর্মী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "চলমান জীবন : প্রথম পর্ব।" তাতে চৌধুরী মহাশয়ের জীবনের সেই অধ্যায়টি আছে যেটির নাম বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সবুজপত্রের যুগ। পবিত্রবাবুকে ধন্যবাদ যে

তিনি এ যুগের বিশিষ্ট লেখকদের ঘরোয়া কথা ফলাও করে বলেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানতেন কি না সন্দেহ। জানলেও বলতেন না হয়তো।

পবিত্রবাবুর বই থেকে নীচে কিছু উদ্ধার করে দিচ্ছি—

"পঁচিশ সালের শেষাশেষি চৌধুরী মহাশয়কে একদিন বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন লক্ষ্য করলাম। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, অথচ আমি উপস্থিত হওয়ার পরও তিনি নীরবে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারছি, মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন চলছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে মুখ খুললেন, 'সবুজপত্র বন্ধ করে দেব ভাবছি, পবিত্র।'...

"আর একটা সিগারেট ধরিয়ে চৌধুরী মহাশয় আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমি আজ পাঁচ বছর ধরে আমার প্রকৃতির অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি। ফলে একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন হয়ে পড়েছি। আলস্য যখন দেহকে আর অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে তখন লেখকমাত্রেরই অন্তত কিছুদিনের জন্য ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যেরও উপকার হয়। আমার কি মনে হচ্ছে জান পবিত্র? Vanity of Vanities, all is Vanity'—আবার চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সোডার গ্লাসের বুদ্বুদগুলো কেমন করে মিলিয়ে যাচ্ছে।...

"মাসখানেক বাদে চৌধুরী মহাশয় একদিন বললেন, 'না, পবিত্র, সবুজপত্র বন্ধ করা গেল না। দেখ, কবি কি জবাব দিয়েছেন।'...

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বেশী দূর পড়তে হল না। সবুজপত্র চালিয়ে যাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের আদেশ প্রত্যক্ষ ভাবেই ধ্বনিত দেখলাম। কবি লিখেছেন:

'...সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বই-কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্বে তোমার ত নিস্কৃতি নেই—প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাতে সর্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী হাওয়াতে মেরে ফেলতে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজ-পত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির উৎসধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক...'

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে পাঁচ বছরেই সবুজপত্র সম্পাদক শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। একে তো তাঁর প্রকৃতি অলস গ্রন্থকীটের, তার উপর দেশের মতিগতির বিরুদ্ধে উজান বেয়ে চলা। আপোস করার কৌশল জানা থাকলে এ দশা হতো না। কিন্তু বিজ্ঞাপন তিনি নেবেন না, মনরাখা কথা বলবেন না, মনোরঞ্জন করবেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো একদিন চলতি ভাষায়, তার পরের দিন সাধু ভাষায় লিখবেন না। রবীন্দ্র-নাথের মতো উপন্যাসের শুরুতে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে শেষটা আত্মসমর্পণ করবেন না। এ কথা বলছি সেদিন এক ভদ্রলোকের মুখে "ঘরে বাইরে"র ভিতরের খবর শুনে। "ঘরে বাইরে" যখন আরম্ভ হয় তখন কবিকে যাঁরা পত্রাঘাত করেন এই ভদ্রলোকও

তাঁদের অন্যতম। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে কবি তাঁর কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেন। ফলে "ঘরে বাইরে" যে জিনিস হতে যাচ্ছিল সে জিনিস হলো না। সমাজের ভালোর কাছে আর্টের ভালোকে খাটো করে কবিগুরু যা করলেন তার দ্বারা না হলো সমাজের ভালো, অর্থাৎ সংস্কার, না হলো আর্টের ভালো, অর্থাৎ সত্যকথন।

সবুজপত্র বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞাপন নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করল বটে, কিন্তু সেও আত্মবিলোপের আগে দপ করে জ্বলে ওঠার মতো। সবুজপত্রবিরহিত প্রমথ চৌধুরী যেন গাণ্ডীববিরহিত অর্জুন। নিরস্ত্রীকৃত বীরবরকে বীরবল বলে কে আর চিনবে, ভয় করবে, মারবে! যুদ্ধফেরৎ জেনারলের মতো নির্বিরোধ তাঁর অবশিষ্ট জীবন। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি তখন (১৯২৯) তিনি রণছোড় সিভিলিয়ান। তখন আমার বয়স পঁচিশ, তাঁর বয়স একষট্টি। দেখাসাক্ষাতের ফলে তাঁর কাছে আমি নতুন কিছু পেলুম তা নয়। পাবার যা তা পেয়েছিলুম বারো তেরো বছর আগে, বারো তেরো বছর বয়সে সবুজপত্র পড়ে।

নতুনের মধ্যে যদি কিছু পেয়ে থাকি তবে তা অকপট প্রশংসা ও স্নেহ। একদিন তিনি সকলের সামনে বললেন, প্রথমটা বুঝতে পারিনি কাকে লক্ষ্য করে। বললেন, আকবর বাদশার দরবারে একবার এক গুণী এলেন। এমন গান শোনালেন যে বড় বড় ওস্তাদেরা তাঁদের শির থেকে শিরোপা খুলে তাঁর দিকে ফেলে দিলেন। আকবর জানতে চাইলেন, ব্যাপার কী। তাঁরা নিবেদন করলেন, জাঁহাপনা, এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, এখন থেকে তুমিই লিখবে, আমরা পড়ব।

এর পরে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কালেভদ্রে হতো। কলকাতার বাইরে আমার বদলির চাকরি। কয়েক বার কলকাতায়, একবার কি দু'বার রাঁচীতে, তিন চার বার শান্তিনিকেতনে, আঠারো বছরে মোট আঠারো বারও হবে না। চিঠিপত্র মাঝে মাঝে দিয়েছি ও পেয়েছি। তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। এক বার তিনি আমার একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে গুরুর কাজ করেছিলেন। "সত্যাসত্য" যখন আরম্ভ করি তখন সংলাপ অংশটা কথ্যভাষায় লিখে বাকীটা লিখতুম সাধুভাষায়। তিনি বললেন, কেন? সবটাই কথ্যভাষায় লিখলে ক্ষতি কী? লিখে ফেল। আমি যদি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা না করতুম, তাঁর উপদেশ না চাইতুম তা হলে পরে আমাকে পশতাতে হতো। সমগ্র ছয় খণ্ড সাধুভাষায় লিখতে আমি হাঁফিয়ে উঠতুম। মাঝখানে রীতিবদল করতেই হতো। সেটা হতো একান্ত অশোভন।

কিন্তু কথ্যভাষা সম্বন্ধে তাঁর মনে খেদ ছিল। এক বার তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি যে কথ্যভাষায় লিখেছি সেটা কাদের কথ্যভাষা? শিক্ষিত স্তরের। কিন্তু তারাই কি সারা দেশ? সাধারণের কথ্যভাষা আমার লেখনীতে ফোটেনি। আমার এ ভাষাও কৃত্রিম।

এ কথায় আমি দুঃখ পেয়েছি। নিজের কীর্তিকেও তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। সাধ্য থাকলে তিনি তাকে ছাড়িয়ে যেতেন, অতিক্রম করতেন। সেই ছাড়িয়ে যাওয়ার, অতিক্রম করার দায়টা আমাদেরই ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন নীরবে।

কিন্তু আসল দায়টা ভাষাগত নয়, ভাবগত। সবুজপত্র কেবল ভাষা নিয়ে লড়াই করেনি, করেছে ভাব নিয়ে। প্রধানত ভাব নিয়ে। সবুজপত্রের একটা ইডিয়োলজী ছিল। সেটা "প্রবন্ধসংগ্রহ"-এর পাতায় পাতায় ব্যক্ত হয়েছে। উদ্ধার করতে হলে অনেকখানি করতে হয়। তবু উদ্ধার না করে পারছিনে।

"যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দ আনা মিল থাকে, তা হলে প্রতি জনে বাকি দু'আনা বাদ দিয়ে, একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাঞ্ছিত কোনো ফললাভের জন্য চেষ্টা করতে পারি। এক দেশের এক যুগের এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দ আনা মিল থাকলেই সামাজিক কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব দুআনার মূল্য ঢের বেশী। কেননা ঐ দুআনা হতেই তার সৃষ্টি ও স্থিতি, বাকি চৌদ্দ আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোলোআনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য সকল দর্শন সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

"একথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাবও পূরণ না করতে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়—শখ, ও তো কল্পনার আকাশে রঙিন কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো, এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে

নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ততই ভালো। অবশ্য ঘুড়ি ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্ততঃ উপরের দিকে চেয়ে দেখতে শেখায়। তবুও এ কথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে-হাতে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো কোনো কথায় মন ভেজে, এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুনগুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়—অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়, আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক-কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ় তত্ত্ব আমরা না জানলেও তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট যে তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রত ভাব। অপরদিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়—তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষ মাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি—নিদ্রিত অশংটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানিনে, কেননা জানিনে। সাহিত্য মানবজীবনের

প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।" (সবুজপত্রের মুখপত্র)

সবুজপত্রের মতবাদ কেবল ঐ একটি উদ্ধৃতি থেকে সম্পূর্ণ জানা যাবে না, কিন্তু মূল সুরটি ধরতে কষ্ট হবার কথা নয়। সাহিত্য মানুষকে অন্ন দিতে পারে না, কিন্তু চেতনা দিতে পারে। সেই চেতনা থেকে বঞ্চিত ছিল আমাদের দেশ, সংস্কৃত শব্দ তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। সবুজপত্র চেতনাসঞ্চারের ভার নিল। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর সংস্কৃত শব্দকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, প্রশ্রয় দিলে সংস্কারের আশা ছাড়তে হয়। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে কেবল সাধুভাষা কথ্যভাষার প্রশ্ন নয়, সংস্কার ও সংস্কার-বিরোধিতার প্রশ্নও আছে। বাংলা ভাষা, বিশেষত ইংরেজী শিক্ষার ফলে জেগে ওঠা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙালীকে অচলায়তনের হাত থেকে বাঁচতে শিখিয়েছে। সবুজপত্রের ভরসা সেইজন্যে বাংলা ভাষার উপরে—যে ভাষা অকৃত্রিম বাংলাভাষা, বাঙালীর মুখের বাংলাভাষা। তাতে অন্যান্য ভাষার শব্দ থাকবে না তা নয়। ইংরেজীও থাকবে, ফরাসীও থাকবে, আরবীও থাকবে, ফারসীও থাকবে, তেমনি সংস্কৃতও থাকবে। কিন্তু প্রধানত থাকবে দেশজ। থাকবে প্রাকৃত।

"সবুজপত্র" যা চেয়েছিল তা পুরাতনের সংস্কার, অন্য কথায় সংস্কারমুক্তি। অতীত সম্বন্ধে তার মোহ ছিল না, যদিও অতীতকে সে অস্বীকার করতে চায়নি। বাইরের বিশ্বকে সে প্রাণভরে

স্বাগত করেছিল, যদিও ফিরিঙ্গিয়ানার সে পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু তার পায়ের তলায় ছিল বাংলাদেশের মাটি। বাঙালীয়ানা। বাঙালীত্বের বনিয়াদের উপরে সে গড়তে ইচ্ছা করেছিল নতুন ধরনের ইমারত। তার মালমশলা অতীত থেকে ও বিদেশ থেকে নিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু তার স্বপ্ন, তার ধ্যান, তার পরিকল্পনা ও কারুকর্ম আধুনিক ও বাঙালী। অবশ্য এমন একটি ইমারত পাঁচ বছরে গড়া যায় না, পঞ্চাশ বছরেও না। যারা গড়বে তারা জমিদারবংশীয় বালিগঞ্জবাসী ব্যারিষ্টার নয়। শেষ বয়সে একটু ব্রাহ্মণ্যভাবও লক্ষ করেছি। সরষের ভিতরে যদি ভূত থাকে তা হলে ভূত ছাড়াবে কে!

এখনো আমাদের মনোজীবনে অতীতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া বাকী। যা পুরাতন তা যদি সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন হয়ে থাকে তবে তা পুরাতন বলে নয়, চিরন্তন বলে গ্রাহ্য। কিন্তু পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে তা চিরন্তন নয়, নিছক পুরাতন, তা হলে তাকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দেওয়াই শ্রেয়। ঠাকুরঘরে তাকে স্থান দিলে ঠাকুরকে স্থান দেব কোথায়? পুরাতন যে জায়গাটা জুড়েছে সে জায়গা থেকে তাকে না হটালে নতুনকে জায়গা দেওয়া অসম্ভব। অথচ মমতা কিছুতেই কাটছে না, মোহ দূর হচ্ছে না। প্রাচীন ও আধুনিকের একটা অবাস্তব ও অলীক সমন্বয়ের চেষ্টাই দেখছি।

তখনকার দিনে সবুজপত্র যে একশ্চন্দ্র ছিল তা নয়। মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস কথাটা অত্যুক্তি। বাংলা মাসিকপত্রের সেইটেই ছিল অষ্টবজ্রসম্মিলন। এতগুলি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা একই সময়ে প্রকাশিত হয়নি তার আগে কিম্বা পরে। এতগুলি প্রথম শ্রেণীর লেখকেরও

একই সময়ে আবির্ভাব হয়নি। সবুজপত্রের যুগ কেবল সবুজপত্রেরই নয়, আরো পাঁচ সাতখানা আদর্শবাদী মাসিকের। তাদের সকলের আদর্শ অবশ্য এক ছিল না, কতকটা পরস্পরবিরোধী ছিল। কিন্তু বিরোধ যদি আন্তরিক হয়ে থাকে তবে তাতেও প্রগতির সাহায্য হয়। আমি তখন নগণ্য বালক মাত্র। কিন্তু আমারও সাধ যেত বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে। সবুজপত্রে, প্রবাসীতে, ভারতীতে লিখতে। বিশেষ করে সবুজপত্রে। পরে আমার লেখা প্রবাসীতে, ভারতীতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু সবুজপত্রে হয়নি, কারণ তত দিনে সবুজপত্র উঠে গেছে। সবুজপত্রের লেখক হবার সাধ আমার মেটেনি, তবু আমি সবুজপত্রেরই একজন। আর কোনো পত্রিকার সঙ্গে আমার মনের মিল, প্রাণের মিল, দিলের মিল এতখানি হয়নি। এমন কি বিচিত্রার সঙ্গে, পরিচয়ের সঙ্গেও না। কল্লোলের সঙ্গে তো নয়ই। অথচ এদের সঙ্গেই আমার লেখকসম্পর্ক। এরাই আমাকে লেখকহিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এদের গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি একসূত্রে বাঁধা। "বিচিত্রা"য় "পথে প্রবাসে" পড়ে চৌধুরী মহাশয়ের ভালো লাগে। সেই প্রথম আমার অস্তিত্ব তাঁর নজরে এলো। তার আগে তিনি আমাকে চিনতেন না। তারও দু'বছর পরে প্রথম দেখা।

পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা সেটা হচ্ছে ষ্টাইল। আমাকে আকর্ষণ করেছিল সবুজপত্রের লেখক বীরবলের তথা প্রমথ চৌধুরীর লিখনশৈলী। এঁরা যে দুই নন এক, এ তথ্য তখন আমার জানা ছিল না। তার পর সুরেশ চক্রবর্তীর ষ্টাইল। বলা বাহুল্য ষ্টাইল হচ্ছে মানুষটা। এঁরা আমাকে

অলক্ষ্যে সাহায্য করেছেন। আমার নিজের ষ্টাইল তৈরি হয়েছে এঁদের সঙ্গে সঙ্গত রেখে। এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। যে রবীন্দ্রনাথ "পলাতকা"র লেখক, "লিপিকা"র লেখক। আরো কারো কারো নাম করা উচিত। তাঁদের সবাই কিছু সবুজপত্র গোষ্ঠীর নন। ষ্টাইল বলতে আমি বুঝি প্রসাদগুণ। মাত্রাজ্ঞান। বাক্‌সংক্ষেপ। লক্ষ্যভেদ। মাধুর্য। কিন্তু ধ্বনির খাতিরে ধ্বনি নয়। বীরবলের, সুরেশ চক্রবর্তীর, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা ছিল। বাক্যকে সুভাষিত করতে গিয়ে অর্থবিচ্যুতি বা অর্থান্তর ঘটত। শ্রুতিকে সন্তুষ্ট বা আকৃষ্ট করতে গিয়ে বুদ্ধিকে বঞ্চিত করা হতো। যথার্থতা বোধ হয় এঁদের কাছে মহামূল্য ছিল না। তার জন্যে আমাকে গান্ধীজীর কাছে পাঠ নিতে হয়েছে। এবং বহু বিদেশী লেখকের কাছে। উপরে যাকে লক্ষ্যভেদ বলেছি যথার্থতা বা প্রিসিশন না হলে তা অসম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র যথার্থতা থাকলেই যে লক্ষ্যভেদ হয় তাও নয়। সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়।

ষ্টাইলের জন্যে আমাকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিক্ষানবীশী করতে হয়েছে। তাঁর অজ্ঞাতে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আর্ট সম্বন্ধে আমার যে ধারণা সে ধারণা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছি। এবং তিনি পেয়েছেন যত দূর বুঝি ক্রোচের কাছে। "প্রবন্ধসংগ্রহ" থেকে আবার খানিকটে তুলে দিই।

"সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা

তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। ···আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনাবোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ কাব্য-জগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। ···বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা— সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ জহুরীর কাছে। অপর পক্ষে এ যুগের পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ, সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর-না কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।

"তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? —অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল বন্ধ না হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের

ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে পান করে, কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো, কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।...

"এইসব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষব্রতী বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে সরস্বতীকে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্যে যত দূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার আমি আজও ততদূর হতে পারিনি।"—(সাহিত্যে খেলা)

আমিও।

বারো তেরো বছর বয়সে আমার মনে মুদ্রিত হয়ে যায় এ ধারণা। এর পরে অনেক বই পড়েছি, অনেক ভেবেছি, হাতে কলমে কাজ করতে করতে ঠেকে শিখেছি অনেক। কিন্তু এখনো আমার স্থির বিশ্বাস সাহিত্য হচ্ছে আত্মার লীলা। সৃষ্টিমাত্রেই তাই। নয়তো বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তার মিলবে কেন? মিলবে কী সূত্রে?

প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং কোনো দিন এই ক্ষুরধার পন্থা থেকে বিচ্যুত হননি। শিক্ষা দেননি। মনোরঞ্জন করেননি। এর পরে

তিনি আরো ত্রিশ বছর ধরে কলম চালিয়েছিলেন। প্রায় বাহাত্তর বছর বয়সে লেখা "সীতাপতি রায়" যাঁরা পড়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন গাণ্ডীববিরহিত অর্জুনও সেই অর্জুন। সবুজপত্র ছিল না, কিন্তু সবুজ রং ছিল।

সবুজপত্র নেই, কিন্তু সবুজ রং আছে। থাকবে।

(১৯৫২)

দুঃসময়ের কবিতা

এই দুর্দিনেও যে বাংলার কবিরা নিরস্ত হননি, সমান উৎসাহে লেখনী চালনা করছেন, এ দৃশ্য আমাকে আনন্দ দেয়। ঢাল তরোয়াল কাস্তে কোদাল যাঁদের আছে তাঁদের আছে। যাঁদের নেই তাঁরা অকারণে হল্লা না করে কলম দিয়ে যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু করলেও অনেক হয়। সেকাজ হয়তো আজকের কাজ নয়, হয়তো কালকের কাজ। এক দিন আগে করা হয়েছে বলে যে সেটা অকাজ, তা তো নয়। সুতরাং আনন্দের হেতু আছে। বিশেষ করে এইজন্যে যে এটা দুঃসময়।

আশ্চর্য এই যে দুঃসময়ের ছাপ তেমন করে এঁদের কারো কবিতায় পড়েনি, যদিও ছায়া পড়েছে এখানে ওখানে। জগৎ জুড়ে খণ্ডপ্রলয় চলেছে, এ দেশও তার সর্ব্বব্যাপী কবলের বাইরে নয়। মানুষের জীবনে, জীবিকায়, বংশরক্ষায়, সঞ্চয়ে, সভ্যতায় কেমন একটা অনিশ্চিত থমথমে ভাব। যত রকম শিল্প সৃষ্টি আছে তাদের মধ্যে একমাত্র লিরিক কবিতাতেই এই ভাবটি ধরে রাখা যায়। কেননা লিরিক হচ্ছে যখনকার তখনকার। নাটক বা নভেল লিখতে বছর ঘুরে যায়। তত দিনে ঝড় এসে ঝড়ের পূর্বের তটস্থভাবটিকে

চুরমার করে দিয়েছে দেখা যায়। তখন স্মৃতির সাহায্যে আজকের দিনটিকে পুনর্গঠন করা সহজ হবে না। সুতরাং আমাদের কবিরা যদি সাড়া দিতে চান তবে এখনকার কথা এখনি বলতে হবে।

কিন্তু কবিদের কাছে নিছক সাময়িকতা প্রত্যাশা করতে নেই। তাঁরা স্বভাবত অন্যমনস্ক। যে লোকে তাঁরা বাস করেন তার অর্ধেকটাই কল্পনা। সেখানে কালগণনার প্রথা নেই। তাঁরা যদি তাঁদের কল্পলোকের প্রতি সত্যাচরণ করেন তা হলেই যথেষ্ট। উপরন্তু যদি বাস্তববোধের পরিচয় দেন তা হলে আরো ভালো। ১৯৪১ সালে লেখা কবিতায় কেন ১৯৪১ সালের দেশ বা কাল অনুপস্থিত এ নিয়ে কবিদের সঙ্গে কোঁদল করা বৃথা। কবির মানসলীলা থাকলেই অনেক থাকল।

বলেছি, দুঃসময়ের ছাপ না পড়লেও ছায়া পড়েছে। এদিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিমলচন্দ্র ঘোষের "দক্ষিণায়ন।" এই কবি বর্তমানের প্রতি বীতরাগ হয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় দিনপাত করছেন।

"আজ তাই দেখা যায় পৃথিবীর বিদীর্ণ গহ্বরে
বিশুষ্ক শস্যের ক্ষেতে, শ্রমশিল্প যন্ত্রের ঘর্ঘরে
অর্ণবে বিমানপোতে বন্দীবাসে বিচারশালায়
নগরে পল্লীতে দুর্গে প্রাসাদে কুটীরে বনচ্ছায়
সন্দিগ্ধ মানবমন··· ··· ··· ···
আজ তাই শোনা যায় পৃথিবীর বিশাল আহত
ভয়াবহ বর্ত্তমানে আতঙ্কিত অসংখ্যের মন
রণোন্মত্ত কাল করে ভীমবেগে মহানিষ্ক্রমণ।" (বর্ষশেষ)

বইখানির বহুস্থলেই সন্দেহের, ষড়যন্ত্রের, বন্দীশালার পুনরুক্তি আছে! মানুষের মন যে বর্তমান ব্যবস্থায় তিক্ত বিরক্ত হয়ে চারি দিকে বিভীষিকা কল্পনা করছে তা এই কবিতাগুলিকেও কেমন একরকম ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য দিয়েছে। এগুলি মোটেই হাল্‌কা জাতের নয়, যদিও স্থলে স্থলে হাল্‌কা হাতের।

বিষ্ণু দে'র "পূর্ব্বলেখ" সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলে রেখেছেন যে কবিতাগুলির অধিকাংশই সামাজিক উপলক্ষে বা ফরমায়েসে লিখিত। তা হলেও সেগুলি সামাজিকতার ধার ধারে না। বরং গাঢ়তর সমাজভাবনায় গুরুভার। শ্লেষ দিয়ে কবি তাঁর ক্লেশ ভুলতে চেয়েছেন। ক্লেশ এই দুঃসহ সমাজব্যবস্থার।

"গণ্ডেরির মহারাজা পার্টি দেয়, মুঠি মুঠি প্রাচুর্য ছড়ায়,
বাগানবাড়ীতে আসে নিমন্ত্রিত ছলে বলে এবং কৌশলে ···
রাজা শুধু ম্রিয়মাণ, বিলাতী কুকুর তার পড়ে গেছে খাদে,
নর্তকীর সঙ্গীত ও গায়িকার নৃত্যশোভা তাই তোলপাড়
করে না বুঝি বা শুধু বনিয়াদী তারই চিত্ত। বেলোয়ারী ঝাড়
একে একে নিভে যায়। বমনবিধুর সেই ঘরের কোণায়
অন্ধকার ছিঁড়ে যায়। পাহাড়ের সূর্য্য ওঠে রক্তাক্ত সোনায়॥"
(পার্টির শেষ)

ক্ষয়িষ্ণু ঊর্দ্ধ শ্রেণীর হাস্যকর অন্ত্য দশা বিষ্ণুবাবুকে আগের চেয়ে অনেকটা হাল্‌কা করেছে, যদিও তিনি তাঁর কমরেডদের মতো নিঃসংশয় নন যে

"মার্ক্‌স্ না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলা বেশে

চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,

শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।” (মুদ্রারাক্ষস)

দুর্যোগের ছায়া ফিকে হয়ে এসেছে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের “শিবির” গ্রন্থে। তবু স্থানে স্থানে জমাট বেঁধেছেও।

“বারুদের গোলা, ক্ষেত, শূন্য এ খামার।

গুণ্ঠনের অন্য পাশে চোখের বিদ্যুতে

কি ছায়া চমকালো।

আসন্ন ঝড়ের দিকে রাত জমকালো।” (হাট)

বিষ্ণুবাবুর শ্লেষ যেমন উপভোগ্য কামাক্ষীপ্রসাদের তেমনি এক একটি ইমেজ। তাঁর এই গুণটির বিকাশ হলে বহু অনাবশ্যক ভঙ্গী অন্তর্হিত হবে। এ কথা বলা চলে অশোকবিজয় রাহার বেলাতেও। এঁর কবিতাও ইমেজ-প্রধান। অর্থাৎ ইনিও ছবি আঁকেন বা আভাসিত করেন।

“নদীর ও পারে আকাশে আবির ঝড়

আল্‌তা গলেছে জলে,

হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,

ধু ধু হাওয়া এলোচুলে—

দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।”

(ফাগুন)

এমন সুন্দর বর্ণনা বহুকাল চোখে পড়েনি। অশোকবিজয় রূপরসিক। জগদীশ ভট্টাচার্যেরও রসবোধ সুপরিণত। তাঁর লিপি-কুশলতা স্থলে স্থলে মাত্রাতিরিক্ত না হলে আরো খুশি হওয়া যেত। ক্ষমতাকে সংযত না করলে তা অক্ষমতায় দাঁড়ায়। তাঁর রচনা অনুভূতিপ্রধান।

"চির চঞ্চল পথে তুমি চলো ওগো চপলাক্ষী
যারা যেতে পারে তারা কি বুঝিবে না-পারার বেদনা,
নিজেরি রচিত নীড়ে যে হয়েছে প্রলয়ের সাক্ষী
দুঃসহ তার জ্বালা সহিবার আছে কার সাধনা।"

(ত্রিশঙ্কু)

প্রজেশকুমার রায়ের লেখা আন্তরিকতায় ভরা। সবগুলি হয়তো কবিতা হয়ে ওঠেনি, উচ্ছ্বাস থেকে গেছে। কিন্তু যে কয়টি উৎরেছে সে কয়টি আদরণীয়।

"চিন্তার রেখা দেখা দেয় ভালে অকালেই আসে টাক,
রাজবেশই বটে, জামায় জুতায় তালি—
আগাগোড়া এই কাহিনীটা যেন পরিহাস লাগে খালি,
রাজার পুত্র ঘরে কথা শোনে, আপিসেতে খায় গালি।"

(কাহিনী)

হরগোপাল বিশ্বাস আপনাকে রাজার পুত্র বলে কল্পনা করেননি, তাই নিরাশ হননি। তিনি মাটির ছেলে, চাষীর ঘরে মানুষ। এত দিন পরে এই একজনকে পাওয়া গেল যিনি সত্যি সত্যি "গণসাহিত্যিক।" অর্থাৎ সহানুভূতিসূত্রে না, জন্মসূত্রে। তাঁর বইখানি পাড়াগাঁয়ের হালচালে সরস, মৃত্তিকার সৌরভ লেগে রয়েছে তার গায়ে।

"জাল লয়ে কোলে যারা গিয়েছিল সবাই পেয়েছে কিছু
খালি পলো হাতে ফিরে কেহ বাড়ি মনোদুখে মাথা নীচু।
দোঁড়া ও পলোতে ধরেছি বোয়াল মৃগেল নওলা ফলি
হাতকে কাৎলা দুটি বাদে আর গেছে দোঁড়া ছিঁড়ে চলি।

৪

বাটা পুঁটি ফ্যাসা খলসে খয়রা বেশালে পড়েছে চেলা
কোলের মাছের গল্পে ক দিন কাটে অবসর বেলা।”
(কোলের মাছ ধরা)

মাছের গল্প শুনে কেউ কিন্তু ভাববেন না যে মাছের দর “এক পয়সায় একটি।” বুদ্ধদেব বসু পরীক্ষা করতে চান ষোলোটি কবিতা ষোলো পয়সায় দিলে জনগণের পাতে পড়ে কি না। এই প্রচেষ্টা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। উপরে যে সব এক টাকা দেড় টাকার কবিতার বইয়ের নাম করেছি বুদ্ধদেবের এ বই তাদের কোনোটির চেয়ে কম দামী নয়, যদিও কমদামী। একটি নমুনা দিই।

“পাপের প্রাচীর দিকে দিকে হবে ভগ্ন
আবার আসবে শিল্পীর শুভ লগ্ন।—
পুঁথিতে রুদ্ধ ক্ষুব্ধ প্রাণের স্বপ্ন রচনা করে
আমাদের দিন যায়
পুঁথি ফেলে দিয়ে তাকালে আপন গোপন মর্মতলে,
ফিরে গেলে তুমি মাটিতে, আকাশে, জলে।
স্বপ্ন আলসে অলস আমরা তোমার পুণ্যবলে
ধন্য, যামিনী রায়।” (যামিনী রায়কে)

(১৯৪১)

তিনটি পল্লীগাথা

জনসাধারণকে আমরা মৌন মূক ম্লান করে রেখেছি। তারা যে কী ভাবে কী বলে আমরা কোনোদিন শুনতে যাইনে। তারা যদি আপনি এসে শোনাতে চায় আমরা শুনতে চাইনে। আমাদের ব্যবহার দেখে মনে হয় আমরাই দেশ, আমরা যা ভাবব তাই দেশের ভাবনা, আমরা যা বলব তাই দেশের বক্তব্য। এই যখন আমাদের মনোবৃত্তি তখন আমাদের কানে পল্লীকবিতা অরুচিকর তো হবেই। কানকেও আমরা তৈরী করেছি সংস্কৃত এবং ইংরেজী ছাঁদে! খাঁটি দেশজ শব্দ সেখানে শ্রদ্ধা পায় না, খাঁটি দেশী সুর তেমন সাড়া তোলে না। আধুনিক বাংলা কবিতার এক কান ইংরেজী, আরেক কান সংস্কৃত। আসল বাংলার জন্যে আধুনিকদের কান নেই।

গৌরীহর মিত্রের "বীরভূমের ইতিহাসে" অনেকগুলি পল্লীগীতি সংগৃহীত হয়েছে। তাদের থেকে তিনটির নমুনা আমি নীচে দিচ্ছি। তিনটিরই ছন্দ এক। বিষয় অবশ্য আলাদা। এ ধরণের ছন্দ আমি আগে কোথাও দেখিনি বা শুনিনি বলে আরো মুগ্ধ হয়েছি।

১। শ্রীকৃষ্ণের ফল ভক্ষণ

অবধান কর কিছু নিবেদন করি
গোকুলে আনিল ফল এক মাগী বুড়ী।
একটা ঝুড়ি মাথে,
একটা ঝুড়ি মাথে, বসলো পথে, লঞা একটা ঢেলে।
ডেকে বলে—ফল নাওসে, যত গোপের ছেলে।
বাপু সব দৌড়ে আয়,
বাপু সব দৌড়ে আয়, ডাকছে তায়, ডাকছে ঘনে ঘনে।
শ্রীদাম বলে ও ভাই কানাই, বুড়ী ডাকছে কেনে।
ইহার সব বৃত্তান্ত,
ইহার সব বৃত্তান্ত, কিছু অন্ত, জান তো গুণের ভাই।
ডাকছে বুড়ী, ধীরি ধীরি, চল কেন্নে যাই।… …

২। বানভাসীর গান

নদী সে দামোদরে বড়াকরে, করছে আনাগোনা
দু' ধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা।
এল বান পঞ্চকোটে,—
এল বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।
দুড়্ দুড়্ শবদে ভাঙ্গে পর্ব্বত পাথর।
মিশায়ে নালা খোলা—
মিশায়ে নালা খোলা, বানের খেলা, নদীর হলো বল।
দামোদরে জড়ো হলো চৌদ্দ তাল জল।

নদীতে আঁটবে কত,—
নদীতে আঁটবে কত, শত শত, নৌকা ভাসে জলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে।… …

৩। অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা

ষুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে।
বেটারা কোক ছাড়িল—
বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হইল, হাজারে হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হল্য ভার।
হলো সব দুভ্যাবনা—
হলো সব দুভ্যাবনা, রাড় কান্দনা, সবাই ভাবে বসে
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে কখন লিবে এসে।……
করিয়া বহু দম্ফ—
করিয়া বহু দম্ফ, দিল ঝম্ফ, পড়িল নদির জলে
সাতারিয়া পার হইল হাজার সাঁওতালে।
বলে সব মার মার—
বলে সব মার মার, ধর ধর এই মাত্র রব
আজি সিহুড়ি জেলা লোটব গিয়ে করে পরাভব।
জাব সব জেহালখানা—
জাব সব জেহালখানা, দিব থানা, মুক্ত করিব চোরে
শুভবাবু রাজা হবেন জ্যজ সাহেবকে মেরে।……

ঐ গ্রাম নিবাস—
ঐ গ্রাম নিবাস, সাধু দাস, তার সঙ্গে জনা চারি
সিহুড়ি আসি জজ্যের কাছে বলেছ বিনয় করি।
আরত্য প্রাণ বাঁচে না—
আরত্য প্রাণ বাঁচে না, কি মন্তনা, কছ্যেন হুজর বস্যে
ঘর কর্ণ্যা পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটলে সেষে। ....

শেষের কবিতাটির রচয়িতা রাইকৃষ্ণ দাশ। ঘটনাটি ১২৬২ সালের। কবির নিবাস কুলকুড়ি গ্রাম লুট হয় ২৩শে শ্রাবণে। ভনিতায় সেসব কথা আছে। মাঝের গীতিকাটি নফর দাসের। ঘটনাকাল ১২৩০ সাল। প্রথম গাথাটির কবি দ্বিজ বলরাম। তাঁর বাড়ী গোবিন্দপুর। দ্বাপরযুগের ঘটনা, রচনা কবেকার উল্লেখ নেই।

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে গীতিকা বা কবিতা লেখার রেওয়াজ লোকসাহিত্যেও ছিল, তার প্রমাণ গৌরীহরবাবুর বই থেকে পাওয়া গেল। এ রেওয়াজ কি লোপ পেয়ে গেছে? যদি না পেয়ে থাকে তো এই যুদ্ধ সম্বন্ধে পল্লীকবিরা কী লিখেছেন বা রচেছেন তা জানতে ইচ্ছা করে।

(১৯৪৪)

"হারামণি"

রসনির্ঝরের দু'টি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হ'য়ে আসছে যুগের পর যুগ। একটির নাম সাহিত্য, অপরটির লোকসাহিত্য। ধারা দু'টি কখনো ভিন্ন, কখনো অভিন্ন। কখনো বিচ্ছিন্ন কখনো অবিচ্ছিন্ন।

সাহিত্যের গৌরবময় যুগে দেখা যায় লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিগূঢ়। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লোকসাহিত্যরূপে শুরু, সাহিত্যরূপে শেষ। কানু বিনা গীত নেই। সেই কানুর গীত লোক-সাহিত্য থেকে সাহিত্যে এসেছে। হোমরের ইলিয়াড, কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্স্‌পীয়ারের হ্যামলেট, গ্যয়টের ফাউষ্ট লোকসাহিত্যনির্ভর।

লোকসাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র ক্ষীণ হ'লে সাহিত্যের রসসঞ্চয় ক্ষয়ে আসে, এর জন্যে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। এ কালের বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চলবে। বই লেখা হচ্ছে বিস্তর, বইয়ের কাটতিও দেদার। কিন্তু লোকসাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক লুপ্তপ্রায়। সেইজন্যে রসের ভাণ্ডারও নিঃশেষিত হয়ে আসছে। এ কথা কবিতার বেলা বিশেষ করে খাটে।

আমাদের অহঙ্কার আমাদের প্রধান শত্রু। যারা লেখাপড়া জানে না, গ্রামে গ্রামে ঘোরে, ভিক্ষা করে খায় তারাও যে সাধ্যমতো রসসৃষ্টি

করছে, এ আমরা জানিনে বা মানিনে। তারা যদি কলাবিদ্যা জানত তা হলে তাদের রচনা সাহিত্য বলেই গণ্য হতো, কলাবিদ্যা জানে না বলে তাদের দ্বারা যা হচ্ছে তা লোকসাহিত্য। তবু তার মূল্য আছে। দশের অগণিত নরনারীর তৃষা মিটছে তাতে।

বাংলার লোকসাহিত্যের ধারা কোনো দিন শুকিয়ে যায় নি, যাবেও না কোনো দিন। দেশবিভাগ সত্ত্বেও সে ধারা তার প্রবাহ রক্ষা করবে। এর প্রমাণ জনাব মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত "হারামণি"। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে দেশ-বিভাগের পরে ঢাকায়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাত বছর আগে। প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে কলকাতায় উনিশ বছর আগে। দেখা যাচ্ছে দেশ দ্বিধাবিভক্ত হলেও লোকসাহিত্য তেমনি অবিভক্ত। তার মানে লোকচিত্ত এক ও অবিভাজ্য।

"হারামণি" হচ্ছে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ। লোকসঙ্গীতকে আমি লোকসাহিত্য বলছি সেই কারণে, যে কারণে পদাবলীকে বলা হয় কাব্য। বাউলের গান, মেয়েলি গান, বারমাসী, জাগ গান, সারি গান, দেহতত্ত্ব যেখানে যা পাওয়া গেছে লিখে নেওয়া হয়েছে। রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও নোয়াখালী এই কয়েকটি জেলার উল্লেখ আছে। কোনো একটি গান রাজশাহী জেলায় শোনা গেছে বলে যে তা রাজশাহী জেলার গান, মালদহের বা দিনাজপুরের নয়, কেউ এ কথা হলফ করে বলতে পারে না। কোন গানের বয়স কত বলবার উপায় নেই। বিশ পঁচিশ বছরও হতে পারে, দু' এক শো বছরও হতে পারে। ভাষা থেকে খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না, তবে এমনও হতে পারে যে মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে ভাষা বদলে আধুনিক হয়েছে।

এই তিনটি খণ্ডের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ লালন ফকিরের গান। লালনের বাড়ী কুষ্টিয়ার কাছে। তাঁর জন্ম হিন্দুর বংশে। এক মুসলমান মহিলা তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। পরে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সাধনা তাঁকে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মর্মস্থলে নিয়ে যায়। তিনি ছিলেন মরমী সাধক। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। "হারামণি" থেকে তাঁর গানের অংশ তুলে দিচ্ছি।

"চাতক স্বভাব না হলে
অমৃত মেঘেব বারি কথায় কি মিলে?
চাতকের এমনি ধারা
তৃষ্ণায় জীবন যাবে রে মারা
তবুও অন্য বারি খায় না তারা মেঘের জল বিনে।"…

"অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়
ভজন সাধন মুখের কর্ম!
ও দেখো তার সাক্ষী চাতক হে
অন্য বারি খায় না সে।"…

"সাঁইজীর লীলা বুঝবি ক্ষ্যাপা কেমন করে
লীলাতে নাইরে সীমা কোন সময় কোন রূপ ধরে!
গোসাঁই গঙ্গা গেলে গঙ্গাজল হয়
গোসাঁই গর্তে গেলে কূপজল হয়
গোসাঁই অমনি করে ভিন্ন জনায় সাধুর বেশ বিচারে।
গোসাঁই আপনার ঘরে আপনি ঘুরি
গোসাঁই সদা করে রস চুরি জীবের ঘরে ঘরে।"

"যে রূপে সাঁই আছে মানুষে
তালার উপর তালা
তাহার ভিতর কালা
মানুষ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা শুধু রসেতে।"...

কেবল লালন ফকিরের গানে নয়, অন্যান্য বাউল ফকিরের গানেও আমরা এই একই সুর, একই তত্ত্ব পাই। এঁরা ভগবানের অন্বেষণ করেন মানুষের মধ্যে, আপনার মধ্যে। "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" জীবাত্মার অন্তরে পরমাত্মা। এই কথাটি বলা হয়েছে নানাভাবে ও নানা ভঙ্গীতে। নমুনা দিচ্ছি:

"আমি মন পাইলাম মনের মানুষ
পাইলাম না
আমি তার মধ্যে আছি মানুষ
তাহা চিনল না।"...

"মানুষ হাওয়ায় চলে হাওয়ায় ফিরে,
মানুষ হাওয়ার সনে রয়
দেহের মাঝে আছে রে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়।

তোমার মনের মধ্যে আছে আর এক মন গো
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে।"...

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।"...

এসব গান একটা বিশিষ্ট সাধনমার্গের বার্তা বহন করে আনে।

রচয়িতারা সাধক। শ্রোতারা সাধনায় বিশ্বাসী। সুতরাং এসব গান ঠিক জনসাধারণের নয়। তা হলেও সাহিত্যের বিচারে উত্তীর্ণ হবার মতো পদ বহু স্থলে বিকীর্ণ। এই যেমন—

"প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা,
গুরু ধরো চিনে।
প্রেমেতে এই জগৎ বাঁধা
মোহম্মদ আর আপনে খোদা
হায় গো প্রেম করো মন প্রেমতত্ত্ব জেনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী
প্রেম করেছিল তারাই শুনি
আর এক মরণে দু'জন মলো প্রেম-সুধা পানে।"

এগুলিকে লোকসঙ্গীত বলাতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাঁকে বারমাসী পড়তে বলি। বারমাসী কোনো ব্যক্তির রচনা নয়, হলেও সে ব্যক্তি বিরহিণী নারী মাত্রেরই মুখপাত্র। বাংলা সাহিত্যে বারমাসীর বয়সের গাছপাথর নেই। আদিকাল থেকে এ সব গান মুখে মুখে ফিরছে। কিছু উদ্ধৃত হলো:

"মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আয়,
জলদি আয়, জলদি আয়।
কত পাষাণ বেধেছে সাধু বৈদাশে,
বৈদাশে, বৈদাশে।
ফাগুন মাসে রোদের জ্বালা,
চৈত্র মাসে নারীর শরীর কালা

বৈশাখ মাসে গেল নারীর অঙ্গে বায়,
রঙ্গে বায়, রঙ্গে বায়।
ঘরের সাধু দূরে যায়, মন লাগে
মোর উদাস হয়,
মাসে মাসে পত্র লিখি সাধু জলদি আয়,
জলদি আয়, জলদি আয়।
কত পাষাণ বেধেছে সাধু বৈদাশে,
বৈদাশে, বৈদাশে।"

"যৌবনজ্বালা বড়ই জ্বালা সইতে
না পারি
যৌবনজ্বালা তেজ্য করে জলে ডুবে মরি।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সাহু
বান্দিও লাওয়ের গুড়া
তুমি সাহু না যাইও বাণিজ্যে
যাবে তোমার খুড়া
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সাহু
বান্দিও লায়ের বাতা
তুমি সাহু না যাইও বাণিজ্যে
যাবে তোমার দাদা।
দুঃখ যৌবন প্রাণের বৈরী।"...

সারি গান এর চেয়ে আরও সরস। তবে সব সময় শ্লীল নয়। একটু শোনা যাক—

"ওহে যে পুষ্করিণী নাইকো জল
কি করিবে কূপে
যে নারীর সোয়ামী নাই
তার কি করিবে রূপে !
জামাই আজকে পরবের দিনে
মান্য কোথাও রবে না।
ওহে দায়ের মিঠা বালু রে
কুড়ালের মিঠা শিল
ভাল মানুষের জবান মিঠা
কামিনীর মিঠা কিল।
জামাই আজকে পরবের দিনে
মান্য কোথাও রবে না।"...

মেয়েলি গানের লেখাজোখা নেই। বেশীর ভাগই মুসলমানের ঘরের। তবে হিন্দুর ঘরের সঙ্গে খুব বেশী তফাৎ নেই। একটু কান পেতে শোনা যাক—

"হলদি কোটা কোটা জামাই মোটা মোটা
সেও হলদি কোটব না, সেও বিয়ে দেব না।
কাঁচা মেয়ে দুধের সর,
কেমনি করবি পরের ঘর।
পরে ধরে মারবি, থাম ধরিয়া কাঁদবি।
কান্‌ছি কোনা ছিট্‌কির ডাল,
ডাল দিয়া উঠাবি পিঠের থাল।"...

আর একটি মেয়েলি গান ভারি মজার! সেটি চুপি চুপি শোনা যাক—

"কুন বা ঘরে স্তিব গো বিমা হুঁ হুঁ হুঁ
স্তগা স্তগা শ্বশুরের ঘরে।
শ্বশুর তো ড্যারা কাটিছে গো বিমা
হুঁ হুঁ হুঁ
স্তনা ভাস্থরের ঘরে।
ভাস্থর তো কোরান পড়িছে গো বিমা
হুঁ হুঁ হুঁ
স্ত না নন্দের ঘরে।
নন্দ তো ঘুম পাড়িছে গো বিমা হুঁ।
তো স্তগা গরুর ঘরে।
গরু তো হামবা হামবা করিছে গো
বিমা হুঁ হুঁ।
স্তনা ভেড়ীর ঘরে।"...

আর না। প্রলোভন সংবরণ করতেই হলো। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। জনাব মুহম্মদ মনস্থর উদ্দীন তাঁর বিশ বছরের অধ্যবসায়ে যে মধুচক্র রচনা করেছেন "গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" দেশ তাঁর কাছে ঋণী।

(১৯৪৯)

বাংলা উপন্যাস

বছর দশ বারো আগে আমি বাংলা উপন্যাস পড়া বন্ধ করে দিয়েছিলুম। বুর্জোয়ারা লিখছে বুর্জোয়াদের জন্যে বুর্জোয়াদের কথা। ও আর কী পড়ব! তাও যদি সত্য ঘটনা সুন্দর করে লিখতে জানত। লেখা যে একটা আর্ট এটাও তারা শিখবে না। লেখা হয়েছে একটা ইন্‌ডাস্‌ট্রি। যুগটা ইন্‌ডাস্‌ট্রির যুগ। আর্টের যুগ তো নয়।

তার পরে ভেবে দেখলুম ও ছাড়া আর কী হতে পারত! আমার এক নম্বর অভিযোগ তো এই যে লিখছে বুর্জোয়ারা। কিন্তু বুর্জোয়ারা না লিখলে কি মজুরচাষীরা লিখত? মজুরচাষীরা লিখতে চাইলে কি কেউ কোনো দিন তাদের বাধা দিয়েছে? ওরাও লিখবে না, এরাও লিখবে না। তা হলে লিখবে কে? জানি এক দিন সূর্য উঠবে, কিন্তু তত দিন চন্দ্র অতন্দ্র থাকলে ক্ষতি কী? চন্দ্র অস্ত গেলেই কি সূর্য তৎক্ষণাৎ উঠবে? একাদশীর চন্দ্রাস্তের পর কি অবিলম্বে সূর্যোদয় ঘটে? না, তা ঘটে না। যত দিন সাহিত্যের ভার চাষীমজুরদের হাতে পড়েনি ততদিন সে ভার বুর্জোয়াদের হাতেই থাকবে। উপায় নেই।

তা না হয় হলো। কিন্তু বুর্জোয়াঁরা কেন সর্বসাধারণের জন্যে লেখে না? কেন লেখে শুধু বুর্জোয়াদের জন্যে? এই আত্ম-কেন্দ্রিকতার হেতু কী? হেতু অস্পষ্ট নয়। বই লিখে ছাপাতে যে খরচটা হয় সেটা সর্বসাধারণ দেয় না। দেয় বুর্জোয়ারাই। লেখকদের যদি জমিদারি থাকত তা হলে বই লিখে জমিদারির টাকায় ছাপানো যেত। বুর্জোয়াদের কাছে হাত পাততে হতো না। কিন্তু সে দিন কি আর আছে? এখন বুর্জোয়ারা কিনবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে কোনো প্রকাশক বই ছাপেন না। ক্রেতার মুখ চেয়ে লিখতে হয়। উপায় নেই।

বেশ। কিন্তু বিষয়টা কেন সেই থোড় বড়ি খাড়া? যে দেশে তরিতরকারির অভাব নেই, বিচিত্র শাক সবজি, সে দেশে কেন খাড়া বড়ি থোড়? এত বড় কৃষক সমাজ আর কোনো দেশে আছে কি? শ্রমিক বলতে যদি গ্রাম্য কারিগরকেও বোঝায় তো এত বড় শ্রমিক সমাজ আর কোন দেশে আছে? কামার কুমোর তাঁতী ছুতোর গয়লা নাপিত মুচি কসাই দর্জি মেথর ডোম এমনি হাজারো নাম। ইউরোপ হলে এদের এক একটা ট্রেড ইউনিয়ন বা সিণ্ডিকেট থাকত। ভারতবর্ষ বলে এদের এক একটা জাত। এদের কথা কি লেখা যায় না?

লেখা যায়। কিন্তু যারা লিখবে তারা ওদের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হবে অভিন্ন হবে, তবে তো ওরা মন খুলবে। ওদের মুখের ভাষা শিখে নেওয়া শক্ত নয়, কিন্তু মনের ভাষার বর্ণপরিচয় বড় কঠিন। আমরা ইংরেজী জানি, কিন্তু ইংরেজকে জানিনে। তেমনি ফিরিওয়ালার বুলি জানি, কিন্তু ফিরিওয়ালাকে জানিনে। বহু ভাগ্যে

একজন কাবুলিওয়ালা রবীন্দ্রনাথের কাছে মন খুলেছিল। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় বুর্জোয়া লেখকদের মজুরচাষীরা বুলিওয়ালা। ওরা সত্যিকার মজুরচাষী নয়, বুর্জোয়াদের চোখে মজুরকে চাষীকে যেমন দেখায় ওরা তেমনি। অর্থাৎ অর্দ্ধেক বুর্জোয়া।

বুর্জোয়ারা লিখবে বুর্জোয়াদের জন্যে, অথচ প্রোলিটারিয়ানদের সম্বন্ধে, এটা আমার প্রত্যাশা করাই অন্যায় হয়েছিল। যারা লেখে তারা যদি বা ও বিষয়ে লেখে যারা পড়ে তারা ক'দিন আগ্রহের সঙ্গে পড়বে! পরের ব্যাপারে আগ্রহ বেশী দিন থাকে না। কিছু দিন পরে ক্লান্তি আসে। সেইজন্যে "কল্লোল" কাগজে যাঁরা সমাজের নীচের তলার কথা লিখতেন তাঁরাই তাঁদের পাঠকদের উৎসাহ না পেয়ে উপরের তলার কথা লিখতে লাগলেন। এ রকম আরো ঘটেছে। ঘটবেও। পরের বিষয়ে কৌতূহল সহজেই বাসি হয়ে যায়, যদি না পরকে আপন করার কৌশল জানা থাকে। তার মানে প্রোলিটারিয়ানের অন্তরে যে শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষটি আছে তার সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। এ ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল বলেই কাবুলিওয়ালা বাঙালীর আপন লোক হয়েছে। এ ক্ষমতা যাঁদের নেই তাঁরা হয়তো কাবুলিকে বাঙালী করে তুলবেন, কিন্তু কাবুলীকে কাবুলী রেখে বাঙালীর ঘরের লোক করতে পারবেন না। তেমনি চাষীকে ভদ্রলোক করে বসবেন, কিন্তু আত্মীয় করতে অক্ষম হবেন।

এই দশ বারো বছরে আমি অনেক ধারণা বিসর্জন দিয়েছি। তাই বাংলা উপন্যাসের কাছে আমার প্রত্যাশা অল্প। এখন আমার প্রত্যাশা অল্প বলে যখন যা হাতে পাই পড়ি বা পড়বার অবসর খুঁজি। যিনি যা জানেন তিনি তাই নিয়ে লিখুন। ফাঁকি না

দিলেই হলো। যদি মানবহৃদয়ের ঠিক সুরটি বাজে তা হলে বুর্জোয়ার জন্তে বুর্জোয়ার বিষয়ে বুর্জোয়ার লেখা বলে নামমঞ্জুর হবে না। শাশ্বত ও সার্বদেশিক মানুষের কাহিনী যদি হয় তো ভাবী কালের প্রোলিটারিয়ান পাঠকও আপনার করে নেবে।

(১৯৪৭)

উপন্যাসের ভবিষ্যৎ

আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি উপন্যাসের উপর পাঠক সাধারণের পক্ষপাত কমবে না। উপন্যাস লোকে চাইবেই, তাদের চাহিদা মেটানোর জন্যে উপন্যাস আমরা লিখবই। তা হলে ভাবনা কী নিয়ে?

ভাবনা এই নিয়ে যে উপন্যাস তো কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে নয়। উপন্যাস হচ্ছে আর্ট। আর্ট হচ্ছে সভ্যতার ফুল। যে দেশে সভ্যতা নেই সে দেশে রাশি রাশি উপন্যাস লেখা হতে পারে, লক্ষ লক্ষ পাঠক দিনে একখানা করে পড়তে পারে, কিন্তু "বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক।"

দক্ষিণ আফ্রিকা এত বড় দেশ। ও দেশের একখানি মাত্র উপন্যাস সব দেশে আদর পেয়েছে, অলিভ শ্রাইনার প্রণীত "আফ্রিকার একটি গোলাবাড়ীর গল্প।" তাও সত্তর বছর আগে লেখা। কই, আর কোনো উপন্যাসের নাম তো শোনা যায় না। এর কারণ কি উপন্যাসের অভাব, ঔপন্যাসিকের অভাব?

না, সভ্যতার অভাব। সভ্যতা মানে লেখাপড়া জানা নয়, আদবকায়দা জানা নয়। সভ্যতা হচ্ছে ভালো মন্দ বাচাই করার

ক্ষমতা, সভ্যতা হচ্ছে ধর্মাধর্ম জ্ঞান, নীতি অনীতিবোধ, রুচি অরুচি বিচার। যেখানে সভ্যতা নেই সেখানে সত্যিকারের ভালো জিনিসের কদর নেই, তেমন জিনিষ যদি বা কেউ লেখে তবে প্রকাশক জোটে না কিম্বা রাষ্ট্র বিরূপ হয়।

আমাদের দেশে সভ্যতার অভাব ঘটবে কি না জোর করে বলা যায় না। ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার সাধ্য নয়। অনেক সময় মনে হয় গ্রীস রোমের বেলা যা হয়েছে, জার্মানীর বেলায় যা হচ্ছে, আমাদের বেলাও তাই হতে পারে। অর্থাৎ সভ্যতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসবে। বই লেখা হবে বিস্তর, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারে এমন বই মিলবে না একটিও। কারণ আমরা দিন দিন অবোধ হয়ে উঠছি। বর্বরতাই আমাদের চোখে শক্তিমত্তা বলে প্রতিভাত হচ্ছে। যা কিছু কোমল, যা কিছু কমনীয়, যা কিছু সুন্দর ও সত্য তা আমাদের কাছে দুর্বলতার ছদ্মবেশ বলে বোধ হচ্ছে।

তা ছাড়া আর একটা শক্তিও কাজ করছে। যে শক্তি রাশিয়ার রূপান্তর ঘটিয়েছে, চীনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে সে যদি ভারতকে হাতে পায় তা হলে তার রূপান্তর ঘটানোর জন্যে উপন্যাসকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করবে। তার সঙ্গে তর্ক বৃথা, কারণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্যে সে বদ্ধপরিকর। উপন্যাস যেহেতু জনগণের প্রিয় সেহেতু যন্ত্রহিসাবে সার্থক।

এইসব কারণে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করব না। তবে যে কোনো ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত থাকব।

(১৯৫০)

উপন্যাসের সাধনা

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস পড়ে আমার বন্ধু বললেন, প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু ঘটে যা নিয়ে একখানা উপন্যাস অনায়াসে লেখা যায়।

কথাটা আমার মনে ধরেনি। তিনি বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন যে ঐ একখানাই আমার দ্বারা হবার ছিল। তার বেশী হবার নয়। ইতিমধ্যে আমি কিন্তু আরো একখানা উপন্যাস লিখে বসে আছি ও বিরাট একটা এপিক উপন্যাসের ভিৎ গাঁথছি। বস্তুত আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস আমার প্রথম লিখিত উপন্যাস নয়। বন্ধুর কথা সত্য হলে আমার প্রথম জাতকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

সেখানি যখন প্রকাশিত হবে—আমি মনে মনে ভাবি—তখন দেশময় সাড়া পড়ে যাবে। তেমন উপন্যাস কেউ কোনোদিন পড়েনি, কারণ তেমন অভিজ্ঞতা আর কোনো লেখকের হয়নি। কিন্তু সে বই প্রকাশ করার পর দেখা গেল সমাদর নয়, অনাদর তার পাওনা। আমার বন্ধুও বিশেষ কোনো মন্তব্য করলেন না। মনে লাগল।

কেন এমন হলো? নিজেকে প্রশ্ন করবার সময় এলো পাঁচ বছর অপেক্ষা করার পরে। কেন একখানা বই জনপ্রিয় হলো, আর একখানা

—সেইখানাই প্রাণ দিয়ে লেখা—উপেক্ষিত হলো? তবে কি সেটা এতই উচ্চাঙ্গের যে এ যুগের লোক তার কদর বুঝবে না, বুঝবে পরবর্তী যুগ? কিম্বা এ দেশের মানুষ তার জন্যে প্রস্তুত নয়, অনুবাদ করে বিলেতে ছাপাতে হবে?

শুরু হলো কঠোর আত্মপরীক্ষা। এক এক করে অনেকগুলো কারণ আবিষ্কার করা গেল। এক এক করে লিপিবদ্ধ করা যাক। প্রথমত, তোমার মনে রাখা উচিত ছিল যে আর সব বিষয়ের মতো উপন্যাসেরও একটা সাধনা আছে। তোমার হয়তো জীবনের অভিজ্ঞতা আছে, তা বলে লিখনের অভিজ্ঞতা আছে তা তো নয়। লিখেছ তো গোটা কয়েক প্রবন্ধ আর কবিতা। তার দরুন হয়তো কিছু লিপিকুশলতা লাভ করেছ। কিন্তু আয়ত্ত করোনি কেমন করে উপন্যাস গড়তে হয়। হাঁ, গড়তে হয়। উপন্যাস এক প্রকার গঠনকর্ম। কবিতার মতো স্বতঃসৃজন নয়। প্রবন্ধের মতো এক ঝোঁকে লেখা নয়। ভ্রমণকাহিনীর মতো স্মৃতিলিখন নয়। গড়তে যদি না শিখে থাক তবে তা শেখ। আর গড়তে যদি ভালো না লাগে তবে উপন্যাস লেখা ছেড়ে দাও। গঠনের কাজ দিনের পর দিন করে যেতে হয়। ধৈর্য যার নেই, ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে উপন্যাস লিখে শেষ করতে চায় তার হাত দিয়ে দৈবাৎ একখানা উতরে গেছে বলে আর একখানাও উত্তীর্ণ হবে এর মতো ভ্রান্তি আর নাই।

দ্বিতীয়ত, কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের মস্ত বড় পার্থক্য কবিতা লিখতে হয় অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, বেশী দেরি করা উচিত নয়। করলে অনুভূতি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। উত্তাপ হারায়। কবিতা হচ্ছে তপ্ত লুচি। উপন্যাসের বেলা সে নিয়ম খাটে না। উপন্যাসের বেলা

জুড়িয়ে যাওয়াই নিয়ম। কাল তোমার জীবনে একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে বলে আজ তুমি উপন্যাস লিখতে বসে যাবে এটা হবার নয়। লিখতে গেলে দেখবে উপন্যাস হয়ে উঠছে না, হয়ে উঠছে রিপোর্ট। মহাযুদ্ধের পর বহু দশক অতিক্রান্ত হলে তার সম্বন্ধে সার্থক উপন্যাস রচিত হয়। বিপ্লব সম্বন্ধেও। কালের ব্যবধান উপন্যাসের বেলা অপরিহার্য প্রয়োজন। তার ফলে রস তেমন ঘন হয় না, অনুভূতি তীব্রতা হারায়। কিন্তু উপন্যাস তো কবিতা নয়। কবিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তার কাজ নয়। তুমি যদি অপেক্ষা করতে না চাও তবে কবিতা লেখ। আর যদি মনে হয় উপন্যাস না লিখে তোমার শান্তি নেই তবে দীর্ঘ জীবনের জন্যে প্রার্থনা করো। হয়তো শেষ দেখে যেতে পারবে না, তবু ঘোড়দৌড়ের মতো কলম চালিয়ে যেয়ো না। উপন্যাসের বেলা খরগোসদের জিৎ নয়, কচ্ছপদেব জিৎ।

তৃতীয়ত, উপন্যাসের চরিত্রসংখ্যা এক নয়, দুই কিম্বা তার বেশী। মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতা না থাকলে শুধুমাত্র ঘটনার অভিজ্ঞতা বা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাসের আসরে নামা ঠিক নয়। কবিতার পক্ষে নিজের মন জানাই যথেষ্ট। উপন্যাসের পক্ষে পরের মন জানাও অত্যাবশ্যক। এর জন্যে চাই অন্তর্দৃষ্টি, চাই দরদ, চাই একাত্ম হবার ক্ষমতা। বহুদর্শিতারও প্রয়োজন আছে। কল্পনা দিয়ে বহুদর্শিতার অভাব পূরণ করা যায় না। কল্পনারও স্থান আছে। সামগ্রিক ভাবে উপন্যাস হচ্ছে কল্পনারই রাজ্য। তা বলে রাণী তো তাঁর রাজত্বের সবখানি নন।

তার পর চতুর্থ ও চরম কথা এই যে উপন্যাসের জীবন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নয় বা তার পরিপূরণ নয় বা তার ক্ষতিপূরণ নয় বা তার

সম্প্রসারণ নয়। উপন্যাসের জীবন তার আপনার জীবন, তার নায়ক নায়িকার জীবন, নায়ক নায়িকার সঙ্গে যুক্ত বহু মানব মানবীর জীবন, জীবনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম বা নিয়তি, জীবনের বৃহত্তর পটভূমি, জাগতিক ব্যাপার, রিয়ালিটি। উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়। ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে যেতে বা উর্ধ্বে উঠতে না জানলে কবিতা লেখা চলে, উপন্যাস লেখা চলে না। ব্যক্তিগত কথাটি এখানে পার্সনাল অর্থে ব্যবহার করেছি।

এই আত্মপরীক্ষার ফলে আমার প্রথম লিখিত উপন্যাস আমার নিজেরই অনুমোদন পেলো না। দ্বিতীয় সংস্করণে ওর অন্তঃসারটুকু রেখে বাকীটা বাদ দিয়ে দিলুম। তাতে তার উত্তীর্ণ হওয়ার পথ সুগম হলো না আরো দুর্গম হলো জানিনে। তবে বইখানা ঠিক উপন্যাস রইল না, হলো বড় গল্প। আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ উপন্যাসই প্রকৃত পক্ষে বড় গল্প। পাঠক পাকড়াবার জন্যে উপন্যাসের আকার নেয়। ফুলতে ফুলতে ঢোল হয়। তাতে নগদ বিদায়ের দিক থেকে সুবিধে, কিন্তু উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর।

আমার বন্ধু বলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে একমত, যে উপন্যাস হবে অন্তত এক হাজার পৃষ্ঠা। ফেনিযে ফাঁপিয়ে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মে। তার কমে জীবনকে ধরাছোঁয়া যায় না। ব্যক্তিগত জীবনের কথা হচ্ছে না, বৃহত্তর জীবনের কথা হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে প্রস্তুতি ক'জন লেখকের আছে? অধিকাংশ লেখকের প্রস্তুতি বড় গল্পের উপযোগী। যদিও সে বড় গল্প মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে উপন্যাস নামে পরিচিত হয়। বড় গল্পের সাধনা উপন্যাসের সাধনার মতো বিপুল নয়। প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু ঘটে যা নিয়ে একটা বড়

গল্প অনায়াসে লেখা যায়, যদি লেখার হাত থাকে। বড় গল্প বলতে উপন্যাস বলেছিলুম আমি ও আমার বন্ধু, বলেছিলুম উপন্যাস কথাটির চলতি অর্থে। এই বিশ বছরে আমাদের দু'জনেরই ধারণা আরো পরিষ্কার হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে পারি উপন্যাস কখনো তিনশো পৃষ্ঠায় হতে পারে না। কিন্তু এখনো আমরা বুঝতে পারিনে তিনশো পৃষ্ঠাই যদি লোকমতের দ্বারা বরাদ্দ হয় তা হলে কী করে তার শিল্পসম্মত ব্যবহার করা যায়? বড় গল্পের পক্ষে তিনশো পৃষ্ঠা বাহুল্য। উপন্যাসের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। এ সমস্যার সমাধান বোধহয় তিনশো পৃষ্ঠায় খণ্ড উপন্যাস লেখা। প্রত্যেকটি খণ্ড হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, চার পাঁচ খণ্ড মিলে হবে পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু এই বা ক'জন পারবেন?

যাঁরা পারবেন তাঁরা তাই নিয়ে থাকবেন। যাঁরা পারবেন না তাঁদের যদি শিল্পানুরাগ থাকে তা হলে তাঁরা দেড়শো পৃষ্ঠার বড় গল্প লিখবেন, নয়তো তার সঙ্গে আরো দেড়শো পৃষ্ঠা জুড়ে তথাকথিত উপন্যাস লিখবেন। সেটা আর্ট নয়, ইণ্ডাষ্ট্রি। বলা যেতে পারে আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি।

সত্যিকারের উপন্যাসের সাধনা এত বিরাট যে একজনের আয়ুষ্কালে একখানার বেশী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। জোর দু'খানা হতে পারে। টলষ্টয় তার সম্যক দৃষ্টান্ত। একদা আমার দুরভিলাষ ছিল সে রকম মহাগ্রন্থ আমি চারখানা লিখব। কিন্তু একখানা লিখতেই বারো বছর লেগে গেল। আর একখানা লিখতে সাত বছরের এষ্টিমেট করেছি। হয়তো দশ বছর লাগবে। মানুষের পরমায়ু, বলবীর্য, অন্নসংস্থান ইত্যাদি গণনার মধ্যে আনতে হবে। তা যদি আনা হয় তা হলে দেখা যাবে দু'খানাই তার সাধ্যের সীমা। তার

বেশী তার সাধ্যের বাইরে। বই লেখা তো কেবল কলম চালানো নয়। দেখতে শুনতে মিলতে মিশতে জীবনের সব রকম সুখদুঃখ পোহাতে ঝড়ঝাপটায় টিকে থাকতে শুধুমাত্র সংসার করতে যে আয়োজনটা লাগে সেটাও বই লেখার অঙ্গ। না, দু'খানাও নয়। একখানাই যথেষ্ট। অদৃষ্ট সহায় না হলে একখানাও হয়ে ওঠে না। আমার বহু ভাগ্য যে আমি আর একখানার জন্যে প্রস্তুত হতে পেরেছি।

ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে মহাভারতে রূপায়িত করার যে কল্পনা ছিল আমার আমি সেটা যোগ্যতরের জন্যে রেখে যাব। "সম্পত্তি ও সন্তান" শীর্ষক অপর উদ্যোগটা তার চেয়েও কঠিন। কারণ এ দুটো হলো মানব জীবনের এলিমেণ্টাল ব্যাপার। এ কাজ আমার সময় থাকলেও আমার দ্বারা হতো না। বোধ হয় কোনো মধ্যবিত্তের দ্বারা সম্ভব নয়। বোধ হয় হিন্দুর হাত দিয়ে হবার নয়। এ ভূমিকা একজন চাষী মুসলমানের জন্যে নির্দ্দিষ্ট বলে মনে হয়। সাহিত্য তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে।

বড় উপন্যাসের জন্যে আমি আর কোনো বড় বিষয়বস্তু দেখছিনে। ছোট উপন্যাসের জন্যে অর্থাৎ তিন খণ্ডে সমাপ্ত প্রায় হাজার পৃষ্ঠার পুঁথির জন্যে বিষয়বস্তুর অসদ্ভাব হবে না। কৌলিক বা পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে অমন বহু উপন্যাস লেখা যায়। শ্রেণীবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকেও অমন অনেক উপন্যাস আসবে। বাংলা-দেশের পাঠকরাও ক্রমে তার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। তবে লেখকরা তৈরি নন। তাঁরা এখনো তিনশো পৃষ্ঠা খরচ করে দেড়শো পৃষ্ঠার বড় গল্প লেখার পক্ষপাতী। নাই বা হলো আর্ট। আমি এই জাতের নভেলের সমঝদার নই। ইণ্ডাষ্ট্রি হিসেবে এর একটা

মূল্য আছে। যেমন সিনেমার। কিন্তু এর মধ্যে আর্ট খুঁজতে যাওয়া ঝকমারি। আমি হলে বিশুদ্ধ বড় গল্প লিখতুম। এবং তার স্বপক্ষে পাঠকদের রুচি গঠন করতুম। এটাও লেখকদের কাজ।

বড় গল্পের উপাদান আমাদের চার দিকে ছড়ানো রয়েছে। হাত বাড়ালেই হাতে উঠে আসে। এর জন্যে খুব বেশী প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। তবে এর জন্যে যেটা সব চেয়ে দরকারী সেটা হচ্ছে মাত্রাবোধ। ঐ দেড়শো পৃষ্ঠার দৌড়। সীমার ভিতর অসীমকে পূরতে জানাই আর্টের বর্ণপরিচয়। ছোট গল্প যেমন নিজের স্বল্প আয়তনের শাসন মেনে নিয়ে রসোত্তীর্ণ হয় বড় গল্পও তেমনি নিজের স্বাভাবিক পরিসরের পরিধি লঙ্ঘন না করেই সার্থক। কিন্তু তার সার্থক হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায় লেখকের অর্থাভাব ও পাঠকের অসন্তোষ।

আমি আজ ছোট গল্প সম্বন্ধে কিছু বলব না ভেবেছি। বাংলার পাঠকেরা ছোট গল্পের মর্যাদা বোঝেন। যদিও দাম দেন না মাসিকপত্রের বাইরে গ্রন্থাকারে। লেখকরাও ছোট গল্পে অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেছেন। বাংলার সাহিত্য জগতে এটা একটা বিপ্লব। একটা বাচাল জাতির পক্ষে বাক্-সংযম কি বিপ্লবধর্মী নয়?

তবে মেজ গল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মেজ গল্প হচ্ছে বড় গল্প ও ছোট গল্পের মাঝামাঝি একটা আর্ট ফর্ম। জীবনের অনেক খুঁটিনাটি ছোট গল্পের সীমানা ছাড়িয়ে যায়, অথচ বড় গল্পের আমলে আসে না। বিশেষ করে মনোজীবনের ব্যাপার মেজ গল্পের বিস্তার

চায়। চল্লিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার কমে রস জমে না। মেজ গল্পকে সাধারণত ছোট গল্পের কোঠায় ফেলা হয়। তার জন্যে আলাদা কোঠা বানাতে হবে। আমাদের মনোজীবন যেমন জটিল হয়ে উঠেছে তা দেখে মেজ গল্পের হাত গুণে বলা যায় এই জাতক স্বনামধন্য হবে।

(১৯৫১)

বাংলা সাহিত্যের গতি

এত কাল বাংলা ভাষাকে আমরা প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গণ্য করে এসেছি। এখন আর তাকে প্রাদেশিক ভাষা রূপে গ্রহণ করলে চলবে না। ইতিমধ্যে সে তার প্রাদেশিক গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতের আরো কয়েকটি ভাষা সম্বন্ধেও এ কথা বলতে পারা যায়। বাংলা, মরাঠী, গুজরাতী, তামিল, উর্দু—এগুলির সাহিত্যসম্পদ এত বেশী যে, এগুলিকে প্রাদেশিক ভাষা বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। হিন্দীর চেয়ে এরা কম সমৃদ্ধ নয়। এদের বিস্তৃতিও বহুদূরব্যাপী। মাথা গুণতি ছাড়া হিন্দীর চেয়ে কিসে এরা ছোট? এদের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়ছে।

বর্তমান অধিকাংশ বাঙালী সাহিত্যিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে লিখলেও সমগ্র ভারতকে সম্মুখে রেখে লেখেন। সমগ্র দেশের সমস্যা, দশের সমস্যাই তাঁদের সাহিত্য রচনার উপজীব্য। তাই বাংলা সাহিত্যকে ন্যাশনাল লিটেরেচার অনায়াসে বলা চলে। 'জনগণমন' এখন সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। বাংলা বই এখন সর্বত্র অনুবাদ করা হয়। রাষ্ট্রভাষা না হলে কি জাতীয় ভাষা হয় না? আমি তো মনে করি বাংলা এখন ভারতের অন্যতম জাতীয়

ভাষা। আর রাষ্ট্রভাষাই বা একটিমাত্র হতে যায় কেন? সুইটজারল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে ফরাসী, জার্মান ও ইটালিয়ান এই তিনটি ভাষারই তুল্য মূল্য। তিনটিই রাষ্ট্রভাষা। কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি ভাষাতেই কাজকর্ম করেন। কোনটির সর্বাধিক প্রচার তাতে কিছু আসে যায় না। তিনটিই সমান সমৃদ্ধ। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তিনটির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। তিনটিই জাতীয় সম্পদ। তাই যদি হয়, তবে ভারতের মতো বিরাট ভূখণ্ডে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা পর্যাপ্ত নয়। পাঁচটি ছয়টি রাষ্ট্রভাষা থাকাই সঙ্গত। উন্নত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মানুষ অন্তরের তাগিদে আকৃষ্ট হয়। ভাষাপ্রীতি প্রচারকার্যের দ্বারা সম্ভব নয়। কবিগুরুর বাংলা গান যেমন জাতীয় সম্পদ সুরদাস বা মীরার ভজনও তেমনি জাতীয় সম্পদ। বাঙালী অবাঙালী সকলেই গানগুলির অনুপম রসে সমভাবে আকৃষ্ট ও আপ্লুত হয়। সুন্দরের কোনো জাত নেই। তা সকলের। সেকালে এ দেশে এমন বিষাক্ত প্রাদেশিকতা ছিল না। ভারতকে একটি ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে একতা যদি এখনি সম্ভব নাও হয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটু চেষ্টা করলেই সম্ভব হতে পারে। সম্ভব হবে একটিমাত্র ভাষার একাধিপত্যের দ্বারা নয়। প্রধান প্রধান ভাষাগুলির সর্বস্বীকৃতির দ্বারা। রাষ্ট্রভাষা না হয় একটিই হলো, কিন্তু জাতীয় ভাষা হবে পাঁচটি ছয়টি। এগুলিকে প্রাদেশিক মর্যাদার উর্ধ্বে জাতীয় মর্যাদা দিতে হবে। বাংলা ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা।

বাংলার বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টিতে আমি আস্থাশীল। বাংলা ভাষার লিখনশৈলী অনেক উন্নত হয়েছে। অনেকেই বেল্ লেৎর (belles

lettres) বা রম্য রচনায় মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। এর চাহিদাও সুস্পষ্ট। পাঠকগোষ্ঠীর উপর সাহিত্যসৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। সেই পাঠকগোষ্ঠী বর্তমানে সংখ্যায় অধিক, সুতরাং পুস্তকের ক্রেতাও অধিক এবং প্রচারও অধিক। পূর্ব বাংলা—যা এখন পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত—সেখানেও বাংলা কেতাবের চাহিদা কিছু কম নয়। কলকাতায় প্রকাশিত বাংলা বই সেখানকার চাহিদা মতো সরবরাহ করতে হলে কলকাতার পাঠক সম্প্রদায়কে পুস্তকপাঠে বঞ্চিত হতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাদের ভালোবাসা পূর্ববৎ রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে বাংলা পুস্তকের প্রকাশকেন্দ্র খুলেছে। কলকাতার ভাষাকেই তারা সাহিত্যিক ভাষার মান হিসাবে নিয়েছে। মাতৃভাষার প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ এই সেদিনও প্রাণ বলি দিয়ে প্রমাণ করেছে।

দেশের মানচিত্র যত সহজে বদলানো যায় মনের মানচিত্র তত সহজে যায় না। তাই দেশ বিভক্ত হলেও মন বিভক্ত হয়নি। পাকিস্থানী কর্তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ও বাংলাকে উর্দুতরো করবার যতই প্রয়াস পান না কেন, কোনো দিনই সফল হবেন না। গাধা পিটিয়ে যেমন ঘোড়া হয় না, তেমনি বাংলা পিটিয়ে উর্দু হবে না। বছর পাঁচেকের মধ্যে বাংলা ভাষাই সেখানকার সরকারী ভাষা হবে। গত ছয় মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানের গণমনোবৃত্তির অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে।

এসব তো হলো আলোর কথা। এই আলোর নীচে আছে অন্ধকার। মানুষের মনে যেন আশা নেই, ভাষা নেই, আনন্দ নেই। কোনো আদর্শের প্রতি বিশ্বাস নেই। মানুষ জীবনের প্রতি

শ্রদ্ধাহীন হয়েছে বলেই; মনুষ্যজীবন তার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে। তাই সে নিজের প্রাণ রাখবার জন্যে অন্যের প্রাণ নিতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রাণের এই অসাড়তা, এই হৃদয়হীনতা, এই প্রেমহীনতা একান্তভাবে বর্জনীয়। বর্তমান সাহিত্যের সাধারণ সুর হচ্ছে মরবিড (morbid) বা অসুস্থ। তাই চোখে পড়ে নিকৃষ্ট গল্প উপন্যাস গোয়েন্দা কাহিনীর প্রবল চাহিদা। শিশুপাঠ্য পুস্তকেও খুনজখমের ছড়াছড়ি। এমন কি মাঝে মাঝে রাজনীতিও আলোচিত হয়ে থাকে। এই ভারসাম্য বা ব্যালান্সের অভাব সর্বত্র লক্ষিত হয়। এর প্রত্যক্ষ হেতু হয়তো গত মহাযুদ্ধ, গৃহবিবাদ ইত্যাদি।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ছিলেন স্থিতধী অর্থাৎ ব্যালান্সড ব্যক্তি। এই ব্যালান্সের অভাব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। সাহিত্যেও তার অন্ধকার ছায়া পড়ছে। সবই যেন টলমল করছে, এখনি ভেঙে পড়বে। এর মূলে রয়েছে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আত্মপ্রত্যয়ের শূন্যতা না ভরলে বেঁচে সুখ নেই। বাঁচার মতো বাঁচতে হলে থামলে চলবে না। দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। অগ্রসর হতে হলে চাই আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। অস্বাস্থ্যকর ক্ষীণজীবী বা ক্ষণজীবী সাহিত্য সে আনন্দোজ্জ্বল প্রাচুর্যের পথ দেখাতে অক্ষম। নতুন কিছু করলেই ভালো কিছু করা হয় না বা 'প্রগতিশীল' হওয়া যায় না। 'প্রগতি' যেখানে অগ্রগতি বা প্রোগ্রেস অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে শাশ্বতের সন্ধান থাকবে, থাকবে অমৃতের আস্বাদ। অফুরন্ত পুস্তক প্রকাশ করলেই প্রোগ্রেস হয় না। প্রকৃত উন্নত বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে পরমা তৃপ্তির সুধা লুকানো থাকে। বাইবেলের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়

বৃহৎ সাহিত্য হবে Waters of life যা না হলে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব মনে হবে। এমন সৃষ্টি এযুগে কোথায়!

মানুষকে শান্ত সাধনশীল হতে হবে। চিত্তবিক্ষেপের নানা কারণকে আয়ত্তের মধ্যে এনে তার উর্ধ্বে উঠতে হবে। তবেই বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর হবে। বর্তমান মানুষ মগ্ন হতে ভুলেছে। কোনো কিছুতে মগ্ন না হলে সত্য আবিষ্কার করা যায় না। তবু আশ্বাসের কথা এই যে, আমরা যেন ক্রমেই নিজেদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছি। পূর্বাপেক্ষা আত্মস্থ হয়েছি। আমরা মোড় ঘুরেছি। এই সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে। এই ক্ষীণ আশার রশ্মিটুকু আমার ক্ষুব্ধ হতাশ চিত্তে আনন্দ ও উৎসাহের বাণী বহন করে এনেছে। আমি আবার নূতন উদ্যমে রসসৃষ্টির কর্মে নিমগ্ন হবার প্রেরণা পাচ্ছি।

নিরানন্দ, রসহীন সংসার, বন্ধ্যা সংসার। রসধারায় স্নাত করে তাকে শ্যামল সুন্দর আনন্দময় করতে হবে। তাই তো শিল্পী সাহিত্যিক সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি রসস্রষ্টার এত প্রয়োজন। দেহের ক্ষুধাকে যেমন আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে, মনের ক্ষুধাকেও তেমনি অতৃপ্ত রাখলে চলবে না। যদি রাখি তো আমরা মানুষের মতো বাঁচতে শিখব না। Man does not live by bread alone—বাইবেলের এই মহার্ঘ বাণীটি মানুষের শাশ্বত পিপাসার ইঙ্গিত বহন করছে। *

(১৯৫২)

* [গত ৫ই আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যায় পাটনা সুহৃৎ পরিষদ ও হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে আমি প্রধান অতিথিরূপে যে ভাষণ দিই, শ্রীযুক্ত প্রীতীশ মিত্র তার সারাংশ লিখে আমাকে দেখতে দেন। তাঁর অনুরোধে আমি সেটি সংশোধন করে ছাপতে দিচ্ছি। স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে বলে মৌখিক ভাষণের সঙ্গে অসঙ্গতি থাকা সম্ভবপর।]

বাংলা বনাম হিন্দী বনাম উর্দু

সেদিন দার্জিলিঙে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি দিল্লীতে বহুকাল ছিলেন। সেই সূত্রে উর্দুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও পরিচয় থেকে প্রীতি। স্বাধীন ভারত হিন্দীকে তার রাষ্ট্রভাষা করেছে, উর্দুকে করেনি, বলে তাঁর সে কী আফসোস! রেডিয়োতে হিন্দুস্তানী চলে না, তাই তিনি হিন্দী খবর শোনো ছেড়ে দিয়েছেন। হিন্দী তিনি ভালোবাসেন না। সংস্কৃতভাঙা গুরুগম্ভীর হিন্দী তিনি বুঝতে পারেন না। উর্দুর মতো রসও নেই তাতে।

"আচ্ছা, স্বাধীন ভারত কি উর্দুকে বাঁচিয়ে রাখবে না? অমন সুন্দর ভাষা ধীরে ধীরে মৃত ভাষা হবে?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, না, তা কেন ভাবছেন?" আমি উত্তরে বল্লুম, "রাষ্ট্রভাষা হওয়া না হওয়ার উপর কি ভাষার জীবনমরণ নির্ভর করে? রাষ্ট্র-ভাষা না হলেই মরণ? হলেই বাঁচন?" তারপর তাঁকে অভয় দিলুম এই বলে যে উর্দুর অনুরাগী হিন্দুদের মধ্যেও অজস্র। তারা কখনো উর্দুর ক্ষতি করবে না, ক্ষতি হতে দেবে না। উর্দু যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ভাষা হয়ে বাঁচতে চায় তবে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু যদি আর পাঁচটা ভাষার মতো সার্বজনীন হতে রাজী

থাকে তা হলে সর্বজন তাকে রক্ষা করবে। এমন কি আমি স্বয়ং উর্দুর পক্ষে। তবে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নয়। রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দী।

তা বলে হিন্দী সম্রাজ্যবাদ আমরা সহ্য করব না। রাষ্ট্রভাষা হবে বলে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সারা দেশের আবহাওয়ায় মিশিয়ে দেবে সে অধিকার তার নেই। তাকে হতে হবে বাংলার মতো প্রগতিশীল, উর্দুর মতো নাগরিক, ইংরেজীর মতো উদার, ফরাসীর মতো সভ্য। নয়তো গায়ের জোরে বা মাথা গুনতির জোরে একটা বিশাল ভূখণ্ডের লিংগুআ ফ্রাঙ্কা (lingua franca) হওয়া যায় না। ঐ রেডিয়ো পর্যন্ত ওর দৌড়। এরপরে সরকারী কাগজপত্রে ওর নির্বাণ।

হিন্দীকে তার নতুন দায়িত্বের উপযুক্ত করে গড়তে হবে। তেমন লোক সরকারী দপ্তরখানায় বা কাশীর টোলে জন্মায় না। জন্মায় মাঠে ঘাটে দোকানে বাজারে কারখানায় কাফিখানায় বন্দরে শিবিরে। এরা যদি সময়মতো না জন্মায় তবে পনেরো বছর পরে ইংরেজী কি সত্যি যাচ্ছে? হিন্দীর সমস্যা হচ্ছে পনেরো বছরের মধ্যে এই সব লোকের জন্ম দেওয়া। হিন্দী যখন এদের হাতে পড়বে তখন তার রূপ হবে কতকটা ইংরেজীর মতো, কতকটা উর্দুর মতো, কতকটা বাংলার মতো। নিশ্চয় সংস্কৃতের মতো নয়। পণ্ডিতেরা চুল ছিঁড়বেন। বলবেন, এ রকম তো কথা ছিল না। কিন্তু কে শুনছে তাঁদের কথা!

সম্প্রতি আমার এক পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আমাকে লিখেছেন, "বাংলার ভবিষ্যৎ মেঘে ঢাকা। হিন্দীর তরুণ অরুণ বাংলায় আলো দিতে শুরু করেছে। গতকাল লাটগৃহে হিন্দী কনভোকেশনে গিয়ে,

লাট মহোদয়, শিক্ষামন্ত্রী, ডাঃ সুনীতিবাবু···প্রভৃতির ভাষণ (প্রথমোক্ত দুইজনের ছাপা এবং তাহা পাঠ) শুনে আশ্বস্ত হয়েছি যে হিন্দীর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে সমুজ্জ্বল। অসংখ্য বাঙালী ছেলেমেয়ে (বৃদ্ধের সংখ্যাও ১৫।২০ জন হবে) পাস সার্টিফিকেট, পুরস্কার ইত্যাদি পেলেন।···”

সেই ইংরেজ ভদ্রমহিলার মতো আমার বন্ধুও বোধ হয় ভাবছেন যে রাষ্ট্রভাষা হওয়া না হওয়ার উপর ভাষার জীবনমরণ নির্ভর করছে। লাট বেলাটের পৃষ্ঠপোষকতা যদি ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির শর্ত হয় তবে বাংলার ভবিষ্যৎ মেঘে ঢাকা বৈকি। কিন্তু এ ভাষা এত দিনে লাটবাড়ীর চৌহদ্দি পেরিয়ে জনসাধারণের ময়দানে পৌঁছে গেছে। এর পৃষ্ঠপোষক এখন হাজার হাজার বাজে লোক, যারা দাম দিয়ে বই কাগজ কেনে বা লাইব্রেরীর চাঁদা দেয়। আমরা তো আশা করছি যে লক্ষ লক্ষ বাজে লোকের পৃষ্ঠপোষকতা পাব যখন বাংলা নাটক ও তার অভিনয় জীবনধর্মী হবে। আমাদের কনভোকেশন বসবে কেন্দুলির মেলায় বা নান্নুরের মাঠে। লাট-বাড়ীতে নয়। আর আমাদের আচার্য হবেন আউল বাউল ফকির দরবেশ বোষ্টমী ভৈরবী, যারা এ দেশের প্রাণরহস্য আয়ত্ত করেছে, যারা পুঁথির পাতায় সবুজ পাতার বাণী খুঁজে যৌবন অপচয় করেনি। ইতিমধ্যে বাংলা গান লক্ষ লক্ষ বাজে লোকের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। শুধু বাংলা দেশে নয়, সারা ভারতে। “জনগণমন” কোন ভাষার গান? এ গান গাওয়া হচ্ছে, এর সুর বাজছে পৃথিবীর বড় বড় রাজধানীতে। হিন্দীর এখনো এমন মহান সৌভাগ্য হয়নি। হবেও না সে যদি লাট বেলাটের আশীর্বাদ কুড়োতে ব্যস্ত থাকে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের আসল কাজ জনগণকে নিয়ে, তাদের ক্ষুধাতৃষা মিটিয়ে। অন্নের মতো অমৃতের জন্যেও তারা ক্ষুধিত তৃষিত। অমৃত দিতে পারি কেবল আমরাই। আর কেউ নয়। মন্ত্রীমণ্ডলের ঝুলিতে অন্ন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু অমৃত বলে তাঁদের কোনো পোর্টফোলিও নেই। কাজেই জনগণ তাঁদের কাছে ও বস্তু আশা করবে না। হিন্দী যদি জনগণের অমৃত জোগানোর জন্যে সরকারী দপ্তরের উপর বরাত দিয়ে বসে থাকে তবে তারা এক দিন নিরাশ হবে। নিরাশ হয়ে বাংলা পড়বে, বাংলা বইয়ের তর্জমা পড়বে। বাংলার ভবিষ্যৎ মেঘে ঢাকা হবে কেবল তখনি যখন বাঙালী সাহিত্যিকরা জনগণকে অমৃত জোগানোর দায়িত্ব অস্বীকার করে যে কোনো উপায়ে টাকা রোজগার করে নামযশ জোগাড় করে কলকাতার প্রাসাদে শুয়ে চোখ বুজবেন। মনে হয় তার দেরি আছে!

না, হিন্দী আমাদের হানি করবে না। রাষ্ট্রভাষার দৌড় রাষ্ট্র পর্যন্ত। জনভাষার দৌড় অসীম।

(১৯৫২)

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা

দশ বৎসর আগে যখন রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন তখন আমাদের দায়িত্ব বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। বাপ বেঁচে থাকলে ছেলে যেমন থাকে আমরা তেমনি ছিলুম। এখন তিনি নেই, আমরা আছি: দায়িত্বের কথা আমাদের কাছে এখন প্রধান প্রশ্ন। তিনি যখন ছিলেন, প্রশ্ন করার প্রয়োজন হলে তাঁর কাছে যেতুম এবং প্রশ্নের উত্তর পেতুম। এখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই। তাঁর অবর্তমানে সেসব প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে। আমাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করতে হয়। অনেক প্রশ্ন জমে গেছে। তার উত্তরের চেষ্টা বহুদিন থেকে চলছে। সে সব প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আজ বলব না। মোটামুটিভাবে বলব—রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী লেখক আমরা, আমরা তাঁর কাছে কী পেয়েছি, তাঁর অবর্তমানে আমরা কী করেছি এবং আমাদের কী করা উচিত।

সাধারণত দেখা যায়, বাপ যদি বড়লোক হয়, ছেলেদের সুবিধা হয়, তাদের খাটতে হয় না, সংগ্রাম করতে হয় না। তারা হাতের কাছে সব পায়। বাপ বেচারাকে খাটতে হয়, সংগ্রাম করতে হয়, সবকিছু তাঁর নিজের হাতে গড়তে হয়। আমরা দেখছি, রবীন্দ্রনাথ

আমাদের খাটুনি বহু পরিমাণে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি সংগ্রাম করেছেন—আমরা তার ফল ভোগ করছি।

বাংলা সাহিত্যে যখন তিনি প্রথম প্রবেশ করেন বাংলা ভাষা তখন কী ছিল আপনারা জানেন। এই ভাষাকে কী রকম অসাধারণ রূপদান তিনি করেছেন আপনারা জানেন। এজন্যে সারা জীবন তাঁকে সাধনা করতে হয়েছে। সাধনা কী কঠিন কাজ তার অল্পস্বল্প অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তাঁর কাজ ছিল মাটি কেটে শহর তৈরি করা, জঙ্গলের পর জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করা। আর আমরা ভালো জমি পেয়ে বাড়ি তৈরি করেছি। কলম ধরলেই আমাদের লেখা আসে, আমরা লিখে যাই। যা আমাদের কাছে এত সহজ হয়েছে সেই কঠিন কাজ তিনি করেছেন। আমরা পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করছি। সময় সময় মনে প্রশ্ন জাগে—আমরা তাতে কী যোগ করেছি, যাতে পরে যারা আসছে তাদের পক্ষে এ-কাজ সহজ হয়। আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় তাঁর অবর্তমানে আমরা যেসব কাজ করছি সেসব কি এমন কিছু কাজ, যাতে ভবিষ্যতে যারা আসছে তাদের সাহিত্য-সাধনা অনায়াসসাধ্য হবে? সে-প্রশ্ন আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা যদি ঋণী হয়ে থাকি, এবং সে-ঋণ যদি শোধ না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আমাদের কী বলবে? ভবিষ্যতের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে, আমাদের বলতে হবে, আমরাও কিছু যোগ করেছি, আমরাও কিছু দিয়েছি। কিন্তু সেটাও চূড়ান্ত নয়। পরে যারা আসবে, তাদেরও কিছু দিতে হবে।

আমাদের উপর যে ভার এসেছে তা কী পরিমাণে পালন করছি সেটা ভেবে দেখতে হবে। ভাষা সম্বন্ধে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ

বাংলা ভাষাকে অসাধারণ রূপ-লাবণ্য-মণ্ডিত করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন তার উপর আর কিছু করবার নেই, কারিগরী ফলাতে চেষ্টা করা আমাদের উচিত নয়, করলে কোনো ফল হবে না। তা ঠিক নয়। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। আমরা যারা ভাষা নিয়ে কাজ করি, আমরা অনুভব করেছি, এই ভাষাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে গেলে সাধারণ লোকের পক্ষে এটা বোঝা সহজ হবে, তাদের এটা প্রাণের ভাষা হবে। যেমন কাব্যে তেমনি নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে—সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে ভাষা যেন সর্ব-সাধারণের ভাষা হয়, তারা যেন এটাকে নিজেদের ভাষা বলে স্বীকার করে, সেটা দেখতে হবে। আমরা এখনও সেখানে পৌঁছতে পারি নি, বার বার একটা বাধা অনুভব করছি। আমরা যেটা লিখছি সেটাকে জনসাধারণ প্রাণের ভাষা বলে গ্রহণ করছে কি না সাহিত্যিকের পক্ষে ভাবনার বিষয়। সেটাকে সম্ভব করার ভার সাহিত্যিকদের উপর।

রবীন্দ্রনাথ আর একটা কাজ করেছেন—পাঠক তৈরি করার কাজ। পাঠক তৈরি না করলে আমরা যা লিখছি, অনেকে তার মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের পাঠক নিজেই তৈরি করেছেন। প্রথমে তাঁকে কেউ স্বীকার করতে চায়নি, বাংলা সাহিত্যে তিনি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছেন। আস্তে আস্তে দেখা গেল, তিনি অনেক পাঠক তৈরি করেছেন, সংখ্যা ক্রমে বেড়ে গেছে। এখন সকলে তাঁকে সহজ ভাবে গ্রহণ করছে। চল্লিশ বৎসর আগে তাঁকে এভাবে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। এত বেশী লোক তাঁর নিন্দা করেছে যে আমরা তা কল্পনা করতে পারি নে।

শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত বলতেন, রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁরা বুঝতে পারেন না, তাঁর কাব্য বোঝা যায় না। আমরা তখন ছেলেমানুষ ছিলুম, আমরা কিন্তু বুঝতে পারতুম। গুরুজনেরা বলতেন, রবীন্দ্রনাথ কী লিখছেন তাঁরা বুঝতে পারেন না। লেখাপড়া-জানা লায়েক ব্যক্তিরাও বলতেন, বুঝতে পারেন না। আমরা ছেলেমানুষেরা তাঁর খুব তারিফ করতুম। এমন কতকগুলি শিক্ষা মানুষের আছে, যা অ-শিক্ষা করা দরকার। মানুষ যা শেখে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা না ভুললে মানুষ নতুন জিনিস শিখতে পারে না। শিক্ষিত লোককে খানিকটা অশিক্ষিত করা দরকার। যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন, সেটা তাঁদের ভোলাতে হবে এবং নতুন জিনিস শেখাতে হবে। এটা সহজ কাজ নয়। কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ এই কঠিন কাজ করে গেছেন। আমাদেরও তা করতে হবে। না করলে আমাদের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। অনেক জিনিস আছে যা লোকের ভুলে যাওয়া উচিত। ভোলানো মস্ত কথা। আমি উদাহরণ দিতে পারব না, হাতের কাছে আসছে না। অনেকদিন থেকে আমি অনুভব করছি, আমাদের শিক্ষা এমনভাবে হয়েছে যে রস জিনিসটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বরং সাধারণ লোক, যাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, তাদের মধ্যে রস গ্রহণের ক্ষমতা বেশী। তাদের কাছে সরাসরি যাওয়া সহজ। তারা সহজে নেবে। Sophisticated-রা দূরে সরিয়ে দেবে। এদের নতুন করে শেখানো কঠিন ব্যাপার, তাতে আমাদের বিপদ।

রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন তাকে রক্ষা করাও অত্যন্ত শক্ত কাজ। তিনি যে মহান্ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন, সে-ঐতিহ্য আগে

যা ছিল, তার সঙ্গে বেশী মেলে না। একজন সাহিত্যিক বন্ধু বলেছেন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একটি দ্বীপ। তার চারদিকে কিছু নেই, শুধু সমুদ্র। তাঁর আগে কিছু ছিল না, পরেও কিছু হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা আগে পাওয়া যায় না, পরেও পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীও নেই, পরবর্তীও নেই। কেন তিনি (সাহিত্যিক বন্ধু) একথা বলেছেন? কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ে। পরেও কিছু নেই—একথা তিনি বলেছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিণতির সঙ্গে তুলনা করে। সহসা মনে হয়—তা বুঝি সত্য। হয়তো সত্য, হয়তো সত্য নয়। আগে কিছু থাক, না থাক, পরে কিছু থাকা দরকার। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদেরও যোগ-বিয়োগ করতে হবে। সেই ঐতিহ্যকে চলমান করতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলা সাহিত্যের মান নেমে গেছে। সেজন্যে আমরা হা-হুতাশ করছি। আজকাল ভালো বাংলা দেখা যায় না। ভালো প্রবন্ধ, ভালো কবিতা পাওয়া যায় না। লোকে আমাদের গালাগাল দেয়। আমরা সেটা নিঃশব্দে পরিপাক করি। আমরা কিছু করছি, এটা দেখাতে হবে। অন্ধকারের প্রতিকার হচ্ছে আলো। সত্যিকার ভালো লেখা যদি আমরা দেখাতে পারি, তা হলে বলতে পারব, বাংলা সাহিত্যের মান আমরা রাখতে পারছি, রবীন্দ্রনাথের পতাকা আমরা বহন করছি, আমরা তাঁর যোগ্য। সেটা যদি না করতে পারি, শুধু তর্ক করে কিছু হবে না। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উত্তীর্ণ হতে পারে, এমন ক'খানা বই লেখা হয়েছে? হয়নি

তা নয়, তবে তার সংখ্যা খুব কম। পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত বংশধর এখনও আমরা হতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এমন কীর্তি আমাদের হয়নি। যা হয়েছে, তা উল্লেখযোগ্য নয় বলে তুলনায় দাঁড়াতে পারে না। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হয়েছে। যেসব বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে অশান্তি ছিল, অতৃপ্তি ছিল, সেটা তিনি কারো কারো কাছে ব্যক্ত করেছেন। তিনি খুব বড় একটা solid জিনিস করে যেতে পারেন নি, যেমন ডনকুইকসোটের মতো বই যা সর্ব দেশের লোক পড়বে। সেজন্যে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। সত্যিকারের drama যাকে বলে তেমন নাটক দিয়ে যেতে পারেননি বলেও তাঁর মনে দুঃখ ছিল। তাঁর দুঃখ ছিল, তিনি মহাকাব্য লিখে যেতে পারেন নি। মহাভারত থেকে বিষয় বেছে নিয়ে নাটক লিখতে পারেন নি বলেও তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। তিনি বলতেন, তোমরা লেখ। শেষ বয়সেও তাঁর মন সম্পূর্ণ সতেজ ছিল।

তাঁর মধ্যে আশ্চর্য দুঃসাহস ছিল। এমন বিষয় ছিল, যা পড়ে লোকে হয়তো মারতে আসবে, তিনি বলতেন, এসব করতে হবে, এসব করার সাহস তোমাদের থাকা উচিত। মহাভারত সম্বন্ধে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন করলে দেখতেন, পুরোনো জিনিস হলেও তাকে কী রকম আধুনিক ছাঁচে গড়ে তোলা যায়। সেটা দুঃসাহসিক কাজ হত। আমরা সেরূপ কাজ করতে পারব কিনা, জানি না। দেশ থেকে দাবী না উঠলে আমাদের পক্ষে করা কঠিন। সাধারণত পাঠকদের কাছ থেকে চাহিদা আসে, আমরা লেখকেরা যোগান দেই। চাহিদা না থাকলে লেখক যোগান দেবে কী! পাঠক আগে আগে যায়,

লেখক যায় তার পিছনে। কিন্তু এমনও হয়েছে—লেখক আগে আগে চলে, পাঠক পিছন পিছন চলে। পাঠক চাক বা না-চাক, রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, বহু বছর পর লোকে তাঁর কথা বুঝতে পেরেছে। প্রায় পঁচিশ বছর লাগল 'চিত্রাঙ্গদা'র দ্বিতীয় সংস্করণ হতে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সে-কাব্যের কত আদর হয়েছে, অনুবাদ হয়েছে। তার মানে এদেশে পাঠক তৈরি হয়নি। অল্প লেখকই পাঠকের অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে। লেখক পঁচিশ বছর ধরে অপেক্ষা করবে, এ-ধৈর্য অল্প লেখকেরই আছে। বাঙালী লেখক হয়তো মনে করে, পঁচিশ বছর সে বাঁচবেই না। পাঠক তৈরি না হলেও আমার যা দেবার দিয়ে গেলুম, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ বহুবার ঘটেছে।

যেসব বিষয়ে তাঁর অতৃপ্তি ছিল, যা করা উচিত ছিল, কিন্তু করা হয়নি—তার কিছু আইডিয়া তিনি আমাদের দিয়েছেন। ছড়ায় কিছু কাজ করা দরকার। Ballad বা গাথা বাংলা সাহিত্যে নেই বললেও চলে, এসব বিষয়ে লোকের মনে মস্ত ক্ষুধা জেগেছে। পাঠক যেন বলছে—তোমরা লেখ, আমরা চাই। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, এ সকল বিষয়ে তাঁর কাছে লোকের অলিখিত দাবী আছে। একদিন না একদিন আমাদেরকে Ballad লিখতে হবে। সাধারণ লোক এগুলি আওড়াবে। আরও জিনিস আছে। মজলিসী গান —একজন গাইলে পাঁচজনে লুফে নেয়। পাঠক যদি এ-জিনিসটি পায়, নিশ্চয়ই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে। কিন্তু এগুলি কে দেবে? এর সম্ভাব্যতা অনেকে জানে না। যা পোষাকী নয়, তার দিকে আমাদের মন যায় না। 'ক্ষণিকা' লেখা হয়েছে পঞ্চাশ

বছর আগে। যেমন হাল্‌কা ভাব, তেমনি লঘু ছন্দ। এর সমকক্ষ হতে পারে, এমন কোনো জিনিস এখন পর্যন্ত হয়নি, এসব লাইনে কাজ করা হয়নি। করা উচিত, এমন কিছু আমাদেরকে দিতে হবে, যেটা লোকে মজলিশে, সমাবেশে, পাঁচজনে মিলে আওড়াতে বা গাইতে পারবে। আমাদের আছে ভজন কীর্তন। লঘু জিনিস নেই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু করে গেছেন। উদাহরণ দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি অবসর পান নি। কত লোকের দাবী তাঁর উপর এসেছে। ব্রাহ্মসমাজ চেয়েছে তাঁকে আচার্য করতে। রাজনীতিকরা চেয়েছেন স্বদেশী আন্দোলনে এসে পরে লড়াই করতে। অনেক জিনিস আরম্ভ করে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ আসেনি তার সমাপ্তি করতে। 'ক্ষণিকা'য় যে সুর তিনি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন, নিজেও না, অন্যেও না, কেউ তার অনুসরণ করেনি। এসব কাজ পড়ে আছে, করতে হবে। তারপর Classic হবার মতো পুস্তক রচনা করা দরকার; এ বিষয়েও আমরা বিশেষ কিছু করতে পারিনি। যা করেছি সমসাময়িকদের জন্যে করেছি। ভাবী কালের জন্যে করা হয়নি। স্পৃহাও নেই, দৃষ্টিও নেই। 'গোরা'র মতো জিনিস আর হল না। ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। 'যোগাযোগে' চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু শরীরে কুলোল না। এগুলি করবার মতো কাজ।

রবীন্দ্রনাথের আর একটা সাধ ছিল—চিরকাল মনে রাখবার মতো করে চরিত্র সৃষ্টি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে যা করা হয়েছে। এমন চরিত্র সৃষ্টি করা দরকার, যা হয়তো একশো দু'শো পাঁচশো বছর থাকবে। তাঁর খেদ ছিল এ বিষয়ে তেমন কিছু করতে পারেন নি।

তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদের সমাপ্ত করতে হবে। চেষ্টা করলে পারব—এমন কথা কেউ সাহস করে বলতে পারে না। তবে কী কী কাজ করা উচিত, সে সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে চেষ্টা সফল হতে পারে।

গতানুগতিক ধারায় আমরা নতুন কিছু করতে পারব না। সে বিষয়ে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। করলে পুনরাবৃত্তি হবে। যেসব কাজ হয়নি, মহাজাতি সদনের মতো যেসব কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, তাকে সমাপ্ত করতে হবে। যা আরম্ভ হয়নি, তাকে আরম্ভ করতে হবে। বহু চেষ্টা করেও যা করতে পারলুম না, পরবর্তী যারা আসবে, তাদের বলব, তোমরা কর। কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে।

প্রত্যেক বছর যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব আসবে, তিনি যে ঐশ্বর্য রেখে গেছেন, সেটা যখন আমরা স্মরণ করব, তখন সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে—আমাদের কাজ আমরা এখনো শেষ করতে পারি নি। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।" যে-কাজ করা দরকার, সে-কাজ যেন আমরা ভুলে না যাই, শয়নে স্বপনে যেন আমরা সেজন্যে বেদনা অনুভব করি। হতাশ হলে কিছু হবে না। পরবর্তী যারা আসছে তাদের উপর ভার দিয়ে যাব। দশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যের অভাব কিছু মিটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় এখনও আমাদের অনেক জিনিস করতে বাকী আছে। তার জন্যে যেন আমরা বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

যে-কাজ তিনি নিজে করতে চেয়েছিলেন, করতে পারেন নি, যে-কাজ আমাদের করা উচিত ছিল, আমরা করতে পারি নি,

সে সম্বন্ধে পাঠক সচেতনভাবে দাবী না জানালেও অচেতনভাবে দাবী জানাচ্ছে, তারা বলছে, আমাদের যা দরকার, তোমরা দিতে পারছ না কেন? সেজন্যে একটা আত্মনিবেদনের ভাব থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সেই ভাব ছিল। আমরাও যেন তার অধিকারী হতে পারি।

[রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে মহাজাতি সদনে প্রদত্ত বক্তৃতা। শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত ও আমার দ্বারা সংশোধিত।]

(১৯৫১)

নিজের কথা

কিছু দিন থেকে চিঠির পর চিঠি আসছে আমার জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নিয়ে। একসঙ্গে সকলের চিঠির উত্তর দিলে সময় বাঁচে। সময় মানে আয়ু। সেইজন্যে এই প্রবন্ধ।

আমার পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল হুগলী জেলার কোতরং। আকবর বাদশার আমলে তোডর মলের সঙ্গে তাঁরা ওড়িশায় যান ভূমি রাজস্ব নির্ণয় করতে। বালেশ্বর জেলায় ভূসম্পত্তি লাভ করে বসবাস করেন। তাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ, কিন্তু বংশপদবী খান্। শুনেছি তাঁদের কর্তা ছিলেন রামচন্দ্র খান্। একে একে অন্যান্য পদবী আমাদের বংশগত হয়। এখনো আমরা মহাশয় বংশ বলেই পরিচিত। মহাশয়েরা বালেশ্বর জেলার নানা স্থানে শাখা স্থাপন করেন, কটক জেলাতেও। যে শাখাটি রামেশ্বরপুর গ্রামের নামে পরিচিত সেই শাখায় আমার জন্ম। জ্ঞাতিবিবাদে নিঃস্ব হয়ে আমার পিতামহ শ্রীনাথ রায় দেশান্তরী হন। আমার পিতা নিমাইচরণ রায় স্কুলের পড়া শেষ করার আগে ব্রিটিশ সরকারের চাকরি নিয়ে অনুগোল যান, সেখান থেকে যান ঢেঙ্কানাল রাজ্যে রাজ সরকারের চাকরি নিয়ে।

ঢেঙ্কানাল রাজ্যের রাজধানী ঢেঙ্কানাল গড়ে আমার জন্ম। তখন সেখানে রেল ষ্টেশন ছিল না, চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল। নিকটবর্তী শহরের নাম কটক। তখনকার দিনে কটক যেতে হলে গোরুর গাড়ীতে করে বাঘ ভালুকের দৃষ্টি এড়িয়ে বিশ বাইশ মাইল যেতে হতো, তার পরে খেয়া নৌকায় মহানদী পার হতে হতো। কটকে আমার মামাবাড়ী। আমার মা হেমনলিনী কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের মেয়ে। পালিতরা কটকে আসেন ব্রিটিশ আমলে, আমি যতদূর জানি। বাংলা দেশের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক রায় বংশের চেয়ে ঘনিষ্ঠ। রায়েরা যেমন সেকেলে পালিতরা তেমনি একেলে। আমার মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিকের সমাবেশ এভাবেই ঘটেছে।

আমার জন্মদিন ইংরেজী মতে ১৫ই মার্চ ১৯০৪। শাক্তবংশের মধ্যে যদিও বৈষ্ণব প্রভাব প্রবেশ করেছিল তবু আমাদের পাঁচ ভাইবোনের নামকরণ শাক্ত পদ্ধতিতে, কেবল ছোট বোনের নাম বৈষ্ণব পদ্ধতিতে। শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই ধর্মের আওতায় আমি মানুষ হয়েছি। ঢেঙ্কানাল রাজ সরকারে তখন নানা দিগ্‌দেশ থেকে কর্মচারী সংগ্রহ করা হতো, অতিথি অভ্যাগত আসতেন নানা অঞ্চল থেকে। মুসলমান ক্রিশ্চান ও ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে আমার পিতা ও পিতৃব্যরা আমাকে শৈশবাবধি পরিচিত হতে দেওয়ায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার গোঁড়ামি ক্ষয়ে যায়।

আমার জীবনের প্রথম সতেরো বছর কেটেছে ঢেঙ্কানালে। ইতিমধ্যে পুরী ও কটকে বার কয়েক গেছি। কিন্তু বাংলাদেশে আসিনি। ছোট-একটা জায়গায় সতেরো বছব কাটলে যা হয়— আমার মধ্যে শেষের দিকে পলাতক ভাব প্রবল হয়েছিল। আমেরিকায়

পালাব স্থির করে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে কটক কলেজে ভর্তি হই। কটকে দু' বছর থেকে আবার সেই পালায়নী বৃত্তির প্রেরণায় পাটনা যাই। পাটনায় চার বছর কাটিয়ে আবার সেই পলায়নপ্রবণতা বশত বিলেত যাই, বিলেতের দু' বছর নামে লণ্ডনে থাকলেও কার্যত ইউরোপের দেশে দেশে বেড়াই। বিলেত থেকে ফিরে বাংলা দেশে নিযুক্ত হই, কিন্তু এমনি আমার বরাত যে কোথাও বেশীদিন থাকতে পাইনে। দেড় বছর কি দু' বছর যেতে না যেতে বদলি।

আমার ভ্রমণের রসদ আমাকেই রোজগার করতে হয়েছে। কী করে রোজগার করতুম যদি না পড়াশুনায় মন দিয়ে জলপানি পেতুম। সেইজন্যে পড়াশুনায় মন দিতে বাধ্য হয়েছি, নইলে পড়াশুনায় আমার মন লাগত না। শৈশব থেকে আমি যা খুঁজেছি তার নাম রস। যে যা চায় সে তা পায়, যদি দাম দেয়, যদি কষ্ট সয়, যদি দুঃখের জন্যে প্রস্তুত হয়। রস চেয়েছি, রস পেয়েছি বলেই একদিন রস দিতে পেরেছি। রসের লেখনী ধরে রস ছিটিয়েছি। সেদিন আমাকে একজন বাঙালী নর্তক বলছিলেন ওড়িশায় যেমন রস আছে ভারতের আর কোথাও তেমন নেই। আমি সে কথা স্বীকার করি। রসের শিক্ষা আমি অনেকের কাছে নিয়েছি, কিন্তু রসের দীক্ষা পেয়েছি ওড়িশার কাছে। জীবনের প্রথম উনিশ বছরে। এবং তার পরেও। একদা আমি ওড়িয়া ভাষার কবি ছিলুম। আমার কবিতা "উৎকল সাহিত্যে" মাসে মাসে বেরোত।

বিলেত থেকে ফিরে আসার এক বছর পরে আকস্মিক ভাবে আমার বিবাহ। আমার পত্নীর নাম য়্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফ।

তিনি আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের কন্যা। সঙ্গীতের সন্ধানে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯৩০ সালে। কিছুদিন পরে ফিরে যেতেন। আমি তাঁকে বন্দী করলুম। ছেলে বেলায় আমেরিকায় পালিয়ে যাবার কল্পনা ছিল। কল্পনা ছিল সে দেশে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার। তা তো হলো না। অবশেষে আমেরিকা এলো আমার ঘর করতে। যে যাকে চায় সে তাকে পায়, এক ভাবে না হোক আরেকভাবে। আমাদের তিন পুত্র, দুই কন্যা। মধ্যম পুত্রটিকে অকালে হারিয়েছি।

আমার সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় দীর্ঘকালের। আমার বয়স যখন ষোলো সেই সময় "প্রবাসী"তে আমার একটি রচনা ছাপা হয়। টলষ্টয়ের একটি কাহিনীর অনুবাদ। সেই বোধ হয় আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা। তার পরে ওড়িয়া ও বাংলা দুই ভাষায়, এমনকি ইংরেজীতেও আমার প্রথম বয়সের বহু রচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু নাম হয় যেদিন "বিচিত্রা"য় "পথে প্রবাসে" নামাঙ্কিত ভ্রমণকাহিনীর আরম্ভ। তার পর থেকে একাদিক্রমে এই উনিশ বছরে ছোট বড় উনিশ কুড়ি খানা বই লিখেছি। কিন্তু বই লেখা আমার পেশা নয়। নেশাও নয়। মাঝখানে কয়েক বছর লেখা ছেড়ে দিয়ে দেখেছি—না লিখলেও চলে। কোনো রকম লেবেল গায়ে আঁটতে আমার ভালো লাগে না। আমি যে একজন লেখক এটাও তো একটা লেবেল। সেইজন্যে মাঝে মাঝে এটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলি। দেখি এর কতটুকু লেগে থাকে। বার বার টানা ছেঁড়ার পর বুঝতে পেরেছি যে আমি অনিবার্য রূপে লেখক অর্থাৎ চেষ্টা করলেও আমি লেখা বন্ধ করতে পারব না। কিন্তু

লেখা কমাতে পারব। সেই চেষ্টাই করছি। লেখা নিয়ে উনিশ বছর ধরে যে পরীক্ষা করেছি তার বিবরণ দিতে হলে আস্ত একখানা বই লিখতে হয়। একদিন লিখব। আজ শুধু এই বলে শেষ করি যে আমি প্রথমত জীবনশিল্পী, দ্বিতীয়ত লিখনশিল্পী। লেখাকে আমি দ্বিতীয় স্থান দিই। তা বলে অবহেলা করিনে। যথাসম্ভব যত্ন করেই লিখি।

(১৯৪৭)

আত্মস্মৃতি

একটা হাসির গল্প বলে আরম্ভ করি। বছর বাইশ তেইশ আগে যখন লণ্ডনে ছিলুম তখন সেখানে এক বোর্ডিং হাউসে কে এক জন সান্যাল আত্মহত্যা করেন। এই নিয়ে আমরা জটলা করছি এমন সময় এলেন শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, এত বিমর্ষ কেন? মুখে নাই হর্ষ কেন? তিনি উত্তর করলেন, কে এক জন সান্যাল আত্মহত্যা করেছে। কালকের খবরের কাগজ পড়ে দেশের লোক ধরে নেবে আমিই সেই সান্যাল। কাজেই গাঁটের কড়ি খরচ করে খান কয়েক তার করে দিতে হলো, আমি নই সেই সান্যাল যে আত্মহত্যা করেছে।

আমিও তেমনি জানিয়ে রাখছি যে, আমি স্বনামধন্য কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের আত্মীয় নই, তেওতার জমিদার বংশে আমার জন্ম নয়, আমরা বৈদ্য নই, এমন কি উপবীতধারীও নই। বিশ বছর আগে নওগাঁ মহকুমার ভার পেয়েছি, এক সাবরেজিষ্ট্রার এলেন সাক্ষাৎ করতে। মুখে হাসি ধরে না। বললেন, আপনিও বৈদ্য, আমিও বৈদ্য, অমুক অমুক অমুক অমুক অমুক বৈদ্য। আমরা এখানে অনেকগুলি বৈদ্য।…নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় এক বক্তা

আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন আঠারো বছর আগে, এঁর আর পরিচয় কী দেব! কে না জানে এঁরা এই জেলার বিখ্যাত জমিদার বংশ!...সতেরো বছর আগে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমি সোনামুখীর বিদ্যালয় দেখতে গেছি। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে সেক্রেটারি বললেন, ইনি ব্রাহ্মণ। আর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ইনিও উপবীতধারী।...এই রকম অজস্র গল্প আছে আমার ঝুলিতে। কলকাতায় মাস কয়েক আগেও এরূপ ঘটেছে। আর একটা বলে বিষয় পরিবর্তন করি।

পাঁচ বছর আগে ময়মনসিংহের সাহিত্যসভায় এক ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধে বললেন, হবে না কেন! যত বড় বড় সাহিত্যিক সকলেই জমিদার। জমিদার না হলে সাহিত্যিক হয় কখনো! শ্রীনলিনাক্ষ সান্যালের মতো আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো, আমরা তেওতার রায় নই। আমাদের জমিদারি অনেক দিন গেছে।

মোগলরা যখন পাঠানদের হারিয়ে দিয়ে ওড়িশার মালিক হয় তখন সুবে ওড়িশা জরিপ করতে যান তোডর মল্লের সহকর্মী রামচন্দ্র খান্। হুগলী জেলার কোতরংনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ঘোষ। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এঁকে একখানা তালুক দেন। সেই জাহাঙ্গীরী তালুক পেয়ে ইনি ওড়িশায় বসবাস করেন। খান্ থেকে কবে এঁরা রায় হলেন, চৌধুরী হলেন, মহাশয় হলেন সে সব আমার জানা নেই। বালেশ্বর ও কটক জেলার সাত-আটটি জায়গায় সাত আট জন মহাশয় আছেন। বড় তরফের বড় কর্তাকে বলা হয় মহাশয়। আমরা হচ্ছি রামেশ্বরপুরের মহাশয় বংশ। অন্যান্য শাখার এখনো কিছু কিছু জমিদারি আছে।

আমরা কিন্তু নির্ভূম মহাশয়। থাকবার মধ্যে আছে কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি। তাও শরিকদের দখলে।

আমার ঠাকুরদাদা শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বিরোধ ছিলেন, জ্ঞাতিদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে চিরকালের মতো রামেশ্বরপুর ত্যাগ করেন। আমার বাবা নিমাইচরণ রায় অল্প বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরি করতে বাধ্য হন। বাপ-মা, ভাই-বোন সকলের ভার তাঁর একার উপরে। সরকারী চাকরি, উন্নতির আশা ছিল, কিন্তু নিকটভবিষ্যতে বদলির আশা ছিল না। অনুগোল তখনকার দিনে পাণ্ডববর্জিত জেলা। শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা বঞ্চিত। তার তুলনায় ঢেঙ্কানাল দেশীয় রাজ্য হলেও সব রকমে অগ্রসর। সেখানকার হাই স্কুলে পড়তে অনুগোল থেকে ও আশেপাশের দেশীয় রাজ্য থেকে বহু ছাত্র আসত। বাবা ভেবে দেখলেন ভাইগুলিকে মানুষ করতে হলে ঢেঙ্কানালে বাস করা ভালো। তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজদরবারে চাকরি নিলেন। আর্থিক সুবিধা কিছুমাত্র হলো না, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ যা পাওয়া গেল তা আশাতীত। রাজা সাহেব ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির গুণগ্রাহী সজ্জন। তাঁর আহ্বানে নানা প্রদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীরা আসতেন কাজ-কর্ম নিয়ে কিছু দিন থাকতে, স্বাস্থ্য ফিরে পেতে। বাঙালীই বেশী। স্কুলের জন্যে যথেষ্ট খরচ করা হতো, অথচ ছেলেদের বেতন লাগত যৎসামান্য। লাইব্রেরীতে রাশি রাশি বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজী বই ছিল। স্থানীয় অফিসারদের কারো কারো ঘরোয়া লাইব্রেরী ছিল। রাজ-বাড়ীতে ছিল থিয়েটার ও চিড়িয়াখানা। রাজার ছিল হাতীশাল,

ঘোড়াশাল। প্রায় প্রত্যেক বছর হাতী ধরা হয়ে আসত। বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলা হতো। অনেকগুলো দীঘি। সাঁতার কাটতে, নৌকায় করে বেড়াতে সুযোগ পেত সকলে। পাহাড়ী জায়গা, চারদিকে জঙ্গল। রেল লাইন নেই। সেটা হয়েছিল শাপে বর।

ঢেঙ্কানালের রাজধানী নিজগড়ে আমার জন্ম। জন্মদিন ১৫ই মার্চ, ১৯০৪। সেদিন ছিল বারুণী। বংশের বড় ছেলে। আদুরে দুলাল। যে দেখে সেই একটা করে নাম রাখে। বারুণীয়া, বৃন্দাবনচন্দ্র, গদাধর, এমনি কত নাম! আমরা শাক্ত, সেইজন্যে অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হলো অন্নদাশঙ্কর। আমার ঠাকুরদা যতদিন ছিলেন নামকরণের ধরণ ছিল শাক্ত। এক এক করে নাম রাখা হয় চার ভাইবোনের—অন্নদাশঙ্কর, অভয়াশঙ্কর, রাজরাজেশ্বরী, অজয়াশঙ্কর। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নেন। সেইজন্যে ছোট বোনের নাম রাখা হলো ব্রজেন্দ্র-মোহিনী। রাজবাড়ীর উপর বাবার কিছু প্রভাব ছিল। বাবার কথায় রাজা সাহেব তাঁর এক ছেলের নাম রাখেন গৌরেন্দ্রপ্রতাপ। আমাদের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হলো শ্রীশ্রীগৌরগোপাল।

আমার মা হেমনলিনী রায় কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের মেয়ে। পালিত বংশ বাংলাদেশ থেকে ওড়িশায় গেছেন উনিশ শতকে। তাঁদের চালচলন হাল ফ্যাশনের। একে তো তাঁরা শহুরে লোক, তার উপর তাঁরা কলকাতার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত। তাঁদের মুখে ভাষা কলকাতার চল্‌তি বাংলা। আর আমাদের মুখের ভাষা অনেকটা মেদিনীপুরের আঞ্চলিক বাংলার মতো ওড়িয়া প্রভাবিত।

আমরা কথায় কথায় বলতুম "কেরে।" অর্থাৎ "করিয়া।" একটা নমুনা দিচ্ছি। চলতি বাংলা: আমি খেয়ে এসেছি। আমাদের বাংলা: আমি খায়ে কেরে আসেছি। এখানে এই "কেরে" শব্দটি সম্পূর্ণ বাহুল্য। কিন্তু বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে, ওড়িশায় এই শব্দ বা এর অনুরূপ শব্দ লক্ষ্য করা যায়। সাধু ভাষায় দাঁড়াবে, আমি খাইয়া করিয়া আসিয়াছি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে আমাদের মুখের ভাষাকে পরিহাস ছলে বলা হয় কেরা বাংলা। আমাদের ঠাট্টা করে বলা হয় কেরা বাঙালী। আমরাও পাল্টা হাসতে জানি। মামাদের বলি বাংলাবালা। এই অর্থে আমার মা ছিলেন বাংলাবালী।

দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ঠাকুমার কোলে মানুষ হয়েছি। ঠাকুমাকে বলতুম মা। মাকে বলতুম, খোকার মা। খোকা আর কেউ নয়, আমি নিজে। এসব আবিষ্কার করতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। মাকে, বাবাকে, বরাবরই একটু পর পর মনে হতো। আমার ঠাকু'মা দুর্গামণি রায় জাজপুরের সম্ভ্রান্ত সেন বংশের মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি শক্তিমতী। সেকালের পক্ষে তিনি বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষার প্রাচীন আধুনিক অনেক বই তাঁর পড়া ছিল, কিম্বা জানা ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী ছিল তাঁর নখদর্পণে। দেশী বিদেশী অনেক রূপকথা, কাহিনী, কিংবদন্তী, গুজব ও খবর ছিল তাঁর ঝুলিতে। তাঁর কাছে রাত্রে ও দুপুরে শুয়ে শুযে আমি যা শিখেছি পরে বই পড়ে তার চেয়ে এমন কী বেশী শিখেছি? তিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, এর চেয়ে বড় কথা তিনি

আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। অল্পবয়সী রুগ্‌ণ মায়ের প্রথম সন্তান, আমার নাকি সম্বলের মধ্যে ছিল একটি মাথা ও কয়েকখানি হাড়। মাংস লাগল ঠাকুমার অবিশ্রান্ত যত্নে। তেল-হলুদ মাখিয়ে শুইয়ে রাখতেন। খাওয়াতেন দুধ আর নরম ভাত। অনেক বয়স পর্যন্ত আমার জন্যে আলাদা রান্না হতো। উঠোনে একটা তোলা উনুনে ছোট একটা হাঁড়িতে সিদ্ধ হতো পুরোনো সরু চাল। তার সঙ্গে আলু। গলা ভাত, আলু ভাতে, কাগজী লেবু ও চিনি, হয়তো এক ফোঁটা ঘি এই ছিল আমার নিয়মিত পথ্য। এ ছাড়া দুধ সর ননী। খুব কম বয়সেই চা ধরি। ঠাকুরদা চা খেতে বসলে আমাদের ডেকে খাওয়াতেন। এই ভাবে ছ'সাত বছর কাটলে পর আমি সব কিছু খেতে শুরু করি, সাধারণত ঠাকু'মাকে না বলে। আমার এই অনিয়মের প্রশ্রয় দিতেন আমার মা। লুকিয়ে একটা কিছু আমার হাতে মুখে গুঁজে দিতেন। প্রতিবেশীরাও আমাকে এটা-ওটা খাইয়ে খুশি হতেন। ফলে আমি হয়ে উঠি যেমন পেটুক তেমনি পেটরোগা। গায়ে গত্তি লাগছে না বলে মা আমার দুঃখ করতেন। কথা নেই বার্তা নেই এক গ্লাস দুধ এনে ঢক ঢক করে গিলিয়ে দিতেন। উল্টো ফল হতো।

দশ বছর বয়সের সময় আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগে। সব সঞ্চয় ছাই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঠাকুরদার মৃত্যু হয়েছিল। এর পরে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যায়। ঠাকু'মা চলে যান বড়কাকার সঙ্গে। মাকে আর বাবাকে নতুন করে পাই। মা ছিলেন অত্যন্ত সরল, স্নেহপ্রবণ, শাসন করতে একেবারেই জানতেন না, কাঁদতেন, গৌরগোপালের কাছে প্রার্থনা করতেন। সংসারের

কাজ তাঁর ভালো লাগত না, লাগত গৌরগোপালের সেবা আর পূজো আর নামকীর্তন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ঝি-চাকর চলে যায়। মাকেই সমস্ত কাজ করতে হতো। শাশুড়ী থাকতে কম কষ্ট পাননি, কিন্তু সেটা কায়িক নয়, মানসিক। এবার পেতে হলো কায়িক কষ্ট। বৈষ্ণব দীক্ষার পর থেকে মাছ-মাংস বারণ। নিরামিষও দুর্মূল্য। বাবার পদোন্নতি হয়েছিল, কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী। একদিন চা বন্ধ করে দিলেন। বাবা একবার যা স্থির করতেন তার আর নড়-চড় হতো না। রাজ্যের লোক জানত তাঁর যে কথা সেই কাজ। সেইজন্যে রাজা-প্রজা সকলে তাঁকে বিশ্বাস করত। তেজস্বী লোক ছিলেন। কোনো দিন তাঁর সাহসের অভাব দেখিনি। মহাযুদ্ধের পেষণে আমরা প্রত্যেকেই গুঁড়িয়ে যেতে লাগলুম। কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতি হলো মা'র। যুদ্ধের পর দেশে শান্তি এলো, কিন্তু আমাদের ঘর গেল ভেঙে। সামান্য কয়েক দিনের জ্বরে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মা'র মৃত্যু হয়। তার কয়েক দিন আগে পলিটিক্যাল এজেণ্টের সঙ্গে ঝগড়া করে বাবা ইস্তফা দিয়েছিলেন। দেওয়ানের অনুরোধে ইস্তফা প্রত্যাহার করেন। নইলে আমরা পথে বসতুম। আমাদের সেই সদাশয় রাজা সাহেব তখন বেঁচে নেই। তিনিও সামান্য অসুখে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তাঁরও তখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স।

বলতে গেলে মাকে আমি ছ'সাত বছরের বেশী পাইনি। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি ছিলুম না। গেছলুম ম্যাট্রিক দিতে কটকে। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। আমি কিন্তু বরাবরই

একটু উদাসীন ছিলুম। আমি বাস করতুম মনোজগতে। আমার একখানা হাতে-লেখা মাসিকপত্র ছিল। সেটা ওড়িয়া ভাষায়। কিন্তু আমার প্রধান পাঠ্য ছিল যত রাজ্যের বাংলা বই ও বাংলা মাসিক-পত্র। আমার হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সেকালের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতেও আমার গতিবিধি ছিল। রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ সরকার মহাশয়ের নাতিরা আমার বন্ধু। সুতরাং আমি ঢেঙ্কানালে বসেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন-আধুনিক অসংখ্য বই পড়তে পেয়েছিলুম, আর মাসে মাসে পড়তে পেতুম "প্রবাসী," "ভারতবর্ষ," "ভারতী," "সবুজপত্র," "মানসী ও মর্মবাণী" "নারায়ণ," "গৃহস্থ," "শিশু," "সন্দেশ," "মৌচাক"। এ ছাড়া ইংরেজী মাসিকের অপ্রতুল ছিল না। এমনি করে আমার সাহিত্যিক রুচি গড়ে ওঠে। একবার স্কুলের পরীক্ষায় প্রাইজ পাই টলষ্টয়ের ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদ। তার থেকে একটার বাংলা অনুবাদ করে "প্রবাসী"তে পাঠিয়ে দিই। তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। বয়স বোধ হয় ষোলো। অবিলম্বে উত্তর এলো লেখাটি "প্রবাসী"তে ছাপা হতে যাচ্ছে। উত্তরদাতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। "তিনটি প্রশ্ন" সেই গল্পটির নাম।

"তিনটি প্রশ্ন" আমার প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগেই আমি স্থির করে ফেলেছিলুম যে, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সাংবাদিক হব ও ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লিখব। ঢেঙ্কানালের শারঙ্গধর দাস ছিলেন আমেরিকায়। তিনি যখন সে দেশ থেকে ফিরলেন আমি ওড়িয়াতে একটা গান লিখলুম ও সেই

গান গেয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা করা হলো। তাঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছি শুনে মা'র মনে সন্দেহ হলো আমিও আমেরিকা যাচ্ছি। তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখলেন। আমার কাছে কথা আদায় করে নিলেন যে, আমি পালাব না। কিন্তু ম্যাট্রিক দেবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কটক যাবার পর আমার প্ল্যান হলো কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় পালানো, কলকাতা থেকে আমেরিকায়। কটকে বসে ছোট কাকাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছিলুম যে, সাত দিনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, কিন্তু সাত দিনের মধ্যে যা ঘটল তা আমার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা নয়, বিধাতার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা। মাকে বেশ ভালো দেখে এসেছিলুম, খবর এলো তিনি নেই। কোথায় আমি চলে যাব আমেরিকায় না তিনি চলে গেলেন স্বর্গে। আমার আমেরিকা যাওয়া হলো না, কিন্তু আমেরিকা এলেন আমার ঘরে আমার বধূরূপে প্রায় দশ বছর পরে।

ছোট কাকাকে বলার ফল হলো এই যে, বাবা আমাকে অনুমতি দিলেন কলকাতা গিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদনা শিখতে। ইতিমধ্যে আমি জর্নালিজমের উপর বইপত্র পড়েছিলুম। কিন্তু আমি রিপোর্টার হতে চাইনি, প্রুফরীডার হতে চাইনি, সাব এডিটর হতে চাইনি, চেয়েছিলুম ফ্রীলান্স হতে। নয়তো লীডার রাইটার হতে। আমার পরমহিতৈষী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাকে পরিচয়পত্র দিলেন, দেখা করলুম "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আমাকে কিছু অনুবাদ করতে দিলেন। তার পর উপদেশ দিলেন শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখতে। ঘোষ-মিত্তিরের

ওখানে গ্রেগ শর্টহ্যাণ্ড আরম্ভ করে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটিং। সওদাগরি আপিসের বাবু তৈরি হচ্ছিল সেখানে। আমার ভালো লাগল না। "সার্ভ্যাণ্ট" সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি আমাকে বললেন প্রুফরীডিং শিখতে। তাঁর দপ্তরের এক ভদ্রলোক আমাকে শেখালেন বটে, কিন্তু এ কথাও বললেন যে আমি তাঁর দানা মারতে এসেছি। শুনে দুঃখ হলো। দেখলুম এঁরা কেউ আমাকে চিনলেন না।

সম্পাদনা শেখবার এই হয়তো সনাতন পদ্ধতি। কিন্তু এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। আধপেটা খেয়ে অসুস্থ হয়ে কী করব ভাবছি এমন সময় ছোট কাকা শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায় লিখলেন, তুমি আমাদের বংশের বড় ছেলে, তোমার কাছে আমরা এর চেয়ে বড় কিছু আশা করেছিলুম। ফিরে এসো, কটক কলেজে আমি তোমাকে ভর্তি করে দেব। আমার কাছে থাকবে। ছোট কাকার কথামতো কাজ হলো। কিন্তু জর্নালিজমের নেশা গেল না। স্থির রইল ঐ হবে আমার পেশা।

সেটা অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। সরকারী কলেজে পড়তে হলো এই যথেষ্ট লজ্জা। সরকারী চাকরি তো অভাবনীয়। আই. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদকী ভাগ্যপরীক্ষায় নামব, এমন সময় খবর পাওয়া গেল আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। স্কলারশিপ পাব নিশ্চয়। মোড় ঘুরে গেল। চললুম পাটনা। স্থির হলো বি. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদনার সুযোগ খুঁজব। কিন্তু এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার

করি। স্কলারশিপও পাই। এম. এ. পড়তে পড়তে আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। প্রথম বারে সারা ভারতে পঞ্চম হই! সেবার মাত্র তিন জন নেওয়া হয়। আমাকে আরেকবার পরীক্ষা দিতে হলো। এবার আমি সারা ভারতে প্রথম হই ও পূর্ববর্তীদের রেকর্ড ভঙ্গ করি। এর পরে তো আর সম্পাদক হওয়ার কথা ওঠে না। ছ'বছরের জন্যে সরকারী খরচে বিলেতে চলে যাই। মনকে বোঝালুম, আচ্ছা, ফিরে এসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সম্পাদক হওয়া যাবে। তখন আমি স্বাধীন। হায়! পুরুষের ভাগ্য দেবতারও অজানা।

ইতিমধ্যে আমার সাহিত্যচর্চ্চা ধীরে ধীরে চলছিল। কলেজে আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করি। তার নাম নন্‌সেন্স ক্লাব। তার একটা হাতে লেখা পত্রিকা ছিল। তাতে যে যা খুশি লিখত। যে কোনো ভাষায়। আমি লিখতুম ইংরেজী বাংলা ওড়িয়া তিন তিনটে ভাষায়। মাঝে মাঝে "প্রবাসী" প্রভৃতি মাসিকপত্রে লেখা দিতুম। "প্রবাসী"তে একবার আমার একটি বড় কবিতা গোড়ার দিকে ছাপা হয়। "ভারতী"তে ছাপা হয় আমার সমাজ-ধ্বংসী রচনা "পারিবারিক নারী-সমস্যা।" লেখকের বয়স মাত্র আঠারো বছর, এ কথা জানা থাকলে "বঙ্গনারী" তার একটা উত্তেজিত প্রতিবাদ লিখে ছাপাতেন না। কত বার তাঁকে আমি পুরীর সমুদ্রতীরে দেখেছি, ভেবেছি নিজের পরিচয় দিয়ে বলি আমিই সেই কালাপাহাড়। কিন্তু আমার সাহস যা কিছু ঐ কাগজে কলমে। মোকাবিলায় আমি একটি ভিজেবেড়াল। "ভারতী" আমার প্রতি সদয় দেখে শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্যে"র উপর একটি প্রবন্ধ

লিখে পাঠিয়ে দিই। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। "ভারতী" তার সমস্তটাই ছাপলেন। শরৎচন্দ্রের এই নির্জলা প্রশংসা তখনকার দিনে নতুন ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানিনে। দীর্ঘকাল পরে যখন তাঁর "শেষ প্রশ্নে"র বিরূপ সমালোচনা করি তিনি মনে করলেন আমি তাঁর নিন্দুক। তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার অবসর হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়াতেও আমার সাহিত্যের কাজ চলছিল। উৎকলের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র "উৎকল সাহিত্য" ইবসেনের "ডল্‌স হাউস" নিয়ে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সম্পাদকপ্রবর ব্রাহ্মনেতা বিশ্বনাথ কর মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্নেহ করতেন। আমার আরো অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা তাঁর আনুকূল্যে ছাপা হয়। সাধারণত তিনি আমাকে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দিতেন। আমার বন্ধুরাও তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেন।

আমাদের সেই ননসেন্স ক্লাবের দলটি কর মহাশয়ের মাসিকপত্রে স্থায়ী আসন পেয়ে সবুজ দল বসে সুপরিচিত হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র মিলে "সবুজ কবিতা" নামে একখানি বই বার করেন। নন্‌সেন্স ক্লাবের মেম্বর নন এমন কয়েক জন লেখক ও লেখিকা পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে "বাসন্তী" নামে একখানি বারোয়ারি উপন্যাস সংরচন করেন। কর মহাশয় তাঁর মাসিকপত্রে এই উপন্যাসটিকেও আশ্রয় দেন। সবুজ দল বলতে এঁদের সবাইকে বোঝায়। বাংলায় যেমন "কল্লোল যুগ" ওড়িয়াতে তেমনি "সবুজ যুগ"। বন্ধুরা আশা করেছিলেন যে, আমি তাঁদের

সঙ্গে থেকে নব নব উত্তমের দ্বারা সবুজ সাহিত্যের খ্যাতি বর্ধন করব। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমি চিন্তা করছিলুম যে, বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষার দুই নৌকায় পা রেখে আমি কালপারাবার পাড়ি দিতে পারব না। কেউ কোনো দিন দুই ভাষায় অমর হয়নি। আমাকে দুটোর একটা বেছে নিতে হবে, যেমন নিয়েছিলেন বঙ্কিম, যেমন নিয়েছিলেন মাইকেল। ঠিক এই রকম একটা সন্ধিক্ষণ এসেছিল কবিবর রাধানাথ রায়ের জীবনে। তিনিও লিখতেন বাংলায়, ওড়িয়ায়। দুই ভাষায়। নামও হয়েছিল বেশ। এমন সময় তিনি বাংলা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র ওড়িয়ায় লেখেন। অক্লান্ত সাধনার ফলে আধুনিক উৎকলের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হন।

আমি কিন্তু রাধানাথের বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। আমি বেছে নিই বাংলা। এর পরে আমি যখন ওড়িয়া লেখায় হঠাৎ ক্ষান্তি দিই আমার বন্ধুরা অবাক হন। সম্পাদক হন বিস্মিত। পাঠকেরা হন ক্ষুণ্ণ। অথচ আমি নিজেও নিশ্চিত ছিলুম না যে একদিন আমি বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হব। আমার পক্ষে ওটা কূল ছেড়ে অকূলে ভাসা। তখনো আমি "পথে প্রবাসে" লিখিনি। বাংলা দেশে কেউ আমাকে চেনে না। "কল্লোল" আপিসের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছি, সাহস হয়নি ঢুকতে। শান্তিনিকেতনে কবিসন্দর্শন করেছি, বলিনি যে আমি একজন সাহিত্যিক। দেখতে দেবার মতো যা আমার ছিল তা "প্রবাসী"র গুটিকয়েক কবিতা, "ভারতী"র গুটি দুয়েক প্রবন্ধ। অপর পক্ষে ওড়িশায় তখন আমি প্রথম পৃষ্ঠার অধিকারী।

বাংলায় লিখব, এই সিদ্ধান্তের পরের ধাপ বাংলা দেশে বাস করব। বিলেতে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত

হয়ে আমি কোন্ প্রদেশে কাজ করতে চাই আমি উত্তর দিলুম, বাংলা দেশে। তাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে আর কোথাও পাঠাতে পারতেন, কিন্তু দেখা গেল আমার ইচ্ছা তাঁরা মেনে নিলেন। বাংলা দেশে আমি আই. সি. এস. হয়ে আসি ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে। তার আগে মাঝে মাঝে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে এসেছি। সতেরো বছর বয়েসের আগে বাংলা দেশ দেখিনি। পঁচিশ বছর বয়সের পর থেকে বাংলা দেশ দেখে বেড়াচ্ছি। বাবা যতদিন ছিলেন ঢেঙ্কানালের বাড়ীতে কালেভদ্রে যেতুম। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের জন্য যাই। পরে একবার দক্ষিণ ভারত দেখে ঢেঙ্কানাল হয়ে ফিরছি এমন সময় আমার মেজ ছেলের অসুখ করে ও চিকিৎসা-বিভ্রাটে কটক হাসপাতালে মৃত্যু হয়। বারো বছর আগে ঘটে এ ঘটনা। তার পর থেকে আর ও-মুখো হইনি। পুত্রশোকের মতো শোক নেই। আমার জীবনের প্রথম উনিশ বছর কেটেছে ওড়িশায়, প্রধানত ঢেঙ্কানালে, পুরীতে ও কটকে। তার পরের ছয় বছর কেটেছে বিহারে ও বিলেতে। তার পরের একুশ বাইশ বছর কাটল বাংলা দেশে। আর দু'মাস পরে আমার সরকারী কর্মজীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি অকালে অবসর নিয়ে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করব। শান্তিনিকেতনে স্থির হয়ে বসব।

সাংবাদিকতার নেশা অনেকদিন ছুটে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে সাহিত্যের কাজই আমার আসল কাজ। এ কাজ শেষ না করে আমার ছুটি নেই। কিন্তু শেষ হবে কী, ভালো করে আরম্ভই হয়নি। যিনি আমাকে এত দূর নিয়ে এসেছেন তিনি আমাকে বাকীটুকু এগিয়ে দেবেন, এই আমার বিশ্বাস। জীবন

বড় বিচিত্র ব্যাপার। কেমন করে কী যে হয় কেউ বলতে পারে না। সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবীশ হয়ে দু'বছরের জন্যে বিলেত যাচ্ছি এমন সময় "বিচিত্রা" বেরোয়। আমার বন্ধু শ্রীকৃপানাথ মিশ্র ভাগলপুরের লোক। সেই সূত্রে "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কৃপানাথের কথায় "বিচিত্রা"য় ছাপতে দিই "রক্তকরবীর তিন জন।" সম্পাদক আরো লেখা চেয়ে পাঠান। তখন বলি, আচ্ছা, আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখে পাঠাব মাসে মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে। "পথে প্রবাসে" শুরু হলো বম্বেতে জাহাজ ধরতে গিয়ে। তিন চার কিস্তি ছাপা হবার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ ভালো লাগে। তেরো চোদ্দ বছর বয়সে এঁরাই ছিলেন আমার আদর্শ কবি, আদর্শ প্রবন্ধকার। চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিকা লিখে দিলেন। আর যা বললেন তা একজন তরুণ সাহিত্যিকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। আকবর বাদশাহের দরবারে এক দিন এক নবীন গুণী এলেন। তাঁর আলাপ শুনে বড় বড় ওস্তাদরা মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফেলে দিলেন। এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব।

হ্যাঁ, জীবন অতি বিচিত্র ব্যাপার। তন্ময় হয়ে পড়ছি দেখলেই মা ধরে নিতেন উপন্যাস পড়ছি। বলতেন, হুঁ! নভেল পড়া হচ্ছে! ছেলে তাঁর নভেল লিখছে দেখলে কী মনে করতেন জানিনে। হয়তো বলতেন, হুঁ! নভেল লেখা হচ্ছে!

(১৯৫১)

ভ্রমণবিরতি

ছেলেবেলায় দেশভ্রমণের শখ ছিল ষোল আনা, কিন্তু পকেটে এক আনাও ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছিল একখানা য়্যাটলাস। সেখানার সবটা ছিল আমার নখদর্পণে। য়্যাটলাস খুলে বসে আমি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দিগ্বিজয় করে আসতুম। বড় হয়ে অনেক দেশ বেড়িয়েছি, দেশভ্রমণের সাধ ষোল আনা না হোক পাঁচ আনা মিটেছে। বাকী এগারো আনাও কে জানে কবে মিটবে! কিন্তু ততঃ কিম্!

ততঃ কিম্ শুনে আপনারা হয়তো অবাক্ হবেন। আমিও এক কালে হতবাক্ হতুম যদি কেউ বলত, কী হবে এত দেশ বেড়িয়ে। গণেশ তাঁর জননীর চতুর্দিক পরিক্রমা করে বিশ্বপরিক্রমার ফল পেয়েছিলেন। কার্তিক সারা জগৎ ঘুরে মিছে হয়রান হলেন। যা ঘরে বসেই পাওয়া যায় তার জন্যে কে-ই বা যায় বাইরে টো-টো করতে! এ ধরণের কথা শুনলে কেবল যে হতবাক্ হতুম তাই নয়, হতাশ হতুম এ দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশীরা আসছে এ দেশে বাণিজ্য করতে, এ দেশের ধন-দৌলৎ লুঠ করতে, ঘরে বসেই যদি এসব

মিলত তবে কেন তারা এতদূর আসত? আর আমাদের পূর্ব-পুরুষরাই কি একদা সাত সমুদ্রে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাননি? ধরণীর ঐশ্বর্য হরণ করে আনেননি?

ততঃ কিম্‌কে তখনকার দিনে আমি উপহাস করেছি, ধিক্কার দিয়েছি তারুণ্যের অভাব বলে। কিন্তু আমার নিজেরই মন এখন প্রশ্ন করছে, ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? তবে কি আমার নিজেরই তারুণ্যের অভাব ঘটল? বয়স বাড়তে বাড়তে চল্লিশ পার হয়েছে, পাকা চুল দেখা দিয়েছে মাথায়। জরার জয়ধ্বজা শীর্ষে বহন করে আমিও কি এখন গণেশের মতো স্থবির হয়েছি?

তা নয়। ইংরেজীতে বলে, ফাষ্ট থিঙ্গস ফাষ্ট। প্রথম কাজটি প্রথমে। যতক্ষণ না প্রথম কাজটি শেষ হয়েছে ততক্ষণ দ্বিতীয় কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম কাজ দেশকে স্বাধীন করা। এর জন্যে তাঁকে সমস্ত ক্ষণ ভারতবর্ষেই থাকতে হচ্ছে। নানা দেশের আমন্ত্রণ তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। গত পঁচিশ বছরে তিনি একবার মাত্র বিদেশে গেছলেন রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে স্বাধীনতার দাবী পেশ করতে। স্বাস্থ্যের জন্যে সিংহলে যাওয়াটা বাদ দিচ্ছি। অথচ এই গান্ধীই এক কালে ভারতের বাইরে সারাটা যৌবন অতিপাত করেছেন। তখন তাঁর হাতের কাজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা। সে কাজ শেষ না করে অন্য কাজ হাতে নিলে অন্যায় করতেন।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমি যে কাজ হাতে নিয়েছি সেটি শেষ না করে আমার ছুটি নেই। সেই কাজটির খাতিরে

আমাকে আপাতত সমস্ত যৌবন অতিবাহিত করতে হবে। আমার কর্মক্ষেত্র বাংলা দেশ। কারণ আমি বাঙালী সাহিত্যিক। এখন আর আমি প্রবাসী বাঙালী নই। মাঝে মাঝে পরিবর্তনের জন্যে আমি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাব, ভারতের বাইরেও যেতে পারি। কিন্তু মন পড়ে থাকবে এখানে। এই বাংলা দেশে। কারণ এ যে আমার কর্মক্ষেত্র। আমার সাহিত্যের কাজ আমার প্রথম কর্ম। সাহিত্যের মধ্যে একটা সহিতের ভাব আছে। সকলের সহিত একাত্ম না হলে সাহিত্য হয় না। কী করে একাত্ম হব, যদি একত্র না থাকি? বাংলার সাহিত্যিককে তাই বাঙালীর সঙ্গে একত্র বাস করে একাত্ম হতে হবে। সেইজন্যে আমাকে দীর্ঘকাল দেশভ্রমণের আশা ত্যাগ করতে হবে।

(১৯৪৫)

উপলব্ধি

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে

১। স্রষ্টার চোখে সব মানুষ সমান। শিল্পীর চোখও স্রষ্টার চোখ।

২। সব ভালো জিনিস সব মানুষের জন্যে। শিল্পও ভালো জিনিস। তাকে গ্রহণ করতে আজ হয়তো সব মানুষ তৈরি নয়, তা বলে তার সার্ব্বজনীনতায় বাধে না। আপাতত একজন মানুষও যদি গ্রহণ করে তা হলেও যথেষ্ট।

৩। সুন্দর জিনিসে চির দিন আনন্দ। শিল্পও সুন্দর জিনিস। তার সামনে পড়ে রয়েছে নিরবধি কাল। যুগ যুগ ধরে সে অপেক্ষা করতে পারে গৃহীত হবার জন্যে।

৪। শিল্পের কাজ প্রেমের কাজও বটে। প্রেম হতে পারে সর্বব্যাপী, হতে পারে একনিবিষ্ট। পরিধি করতে পারে নিখিল মানবকে, নিখিল প্রাণকে, নিখিল সৃষ্টিকে। একই সময়ে কেন্দ্রিত হতে পারে একমাত্র প্রিয়জনে।

৫। প্রেমিক ও তার প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ভগবান আপনাকে ভালোবাসেন। তনু মন ও আত্মার মাঝখানে কোনো ভেদরেখা নেই, তবে প্রভেদ আছে বৈকি।

৬। সব জিনিস এক। এক-কেই বলি ভগবান।

৭। তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র সক্রিয়। যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না সেখানেও। কী তাঁর ইচ্ছা, জানতে হবে। সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। করতে গিয়ে যদি হারাতে হয় যা কিছু প্রিয়, যদি না থাকে পুরস্কারের আশা, তা হলেও করতে হবে তাঁর ইচ্ছাপূরণ।

৮। ইতিহাসের দিক থেকে আমরা এসে পৌঁছেছি এক অচল অবস্থায়। না শান্তি, না প্রগতি, না সভ্যতা, না সংস্কৃতি, না শিল্প কোনো কিছুই হবার নয়, যত দিন না বৃহৎ একটা পদক্ষেপ ঘটছে সামাজিক সুবিচারের অভিমুখে।

(৮ই মে, ১৯৪৯)

পুনশ্চ—আটচল্লিশ বছর বয়সে

৯। এ যুগটা বিরোধের যুগ। আমি যদি পক্ষভুক্ত না-ও হই, যদি শুধু মধ্যস্থ হিসেবে শান্তির জন্যে হস্তক্ষেপ করি, তা হলেও আমাকে ঝুঁকি নিতে হয় যন্ত্রণার, ঝুঁকি নিতে হয় মৃত্যুর। এটা গায়ে পড়ে ডেকে আনা উচিত নয়। বরং এড়াতে পারলে ভালো হয়। কারণ আমি শিল্পী। আমার হাতে এক রাশ সৃষ্টির কাজ। যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে এটা ভগবানের ইচ্ছা তা হলে অবশ্য হস্তক্ষেপ করব, নয়তো আমি হস্তক্ষেপ করব না বাইরের ব্যাপারে। তন্ময় রইব সৃষ্টির কাজে। মৌন অবলম্বন করব আর সব বিষয়ে।

১০। যেমন বাইরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না, তেমনি ঘরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সইব না। আমার সৃষ্টির দুর্গ রক্ষা করতে

আমি সমস্তক্ষণ প্রস্তুত থাকব। রক্ষা করতে হবে তাদের হাত থেকে যারা বলবে আমাকে পক্ষভুক্ত হতে, যারা বলবে মধ্যস্থ হয়ে হস্তক্ষেপ করতে, যারা বলবে ফরমায়েস মাফিক লিখতে, যারা বলবে স্বাধীনভাবে না লিখতে। যন্ত্রণা যদি পেতেই হয়, প্রাণ যদি দিতেই হয় আমাকে তবে তা হোক মুক্ত-শিল্পীরূপে, শিল্পীর মুক্তি সংরক্ষণ করতে। আর কোনো কারণে নয়, যদি না বিধাতার ইচ্ছা হয় অন্যবিধ। আত্মার অসিতে শান্ দিতে থাকব প্রতিনিয়ত, কিন্তু সে অসি কোষমুক্ত হবে না কদাপি, যদি হয় তবে তা কদাচিৎ।

১১। আমার কর্মে অনুক্ষণ থাকবে আনন্দের সত্তা, জীবনের রস। দুঃখমোচন করতে না পারি, সুখবর্ধন করে যাব।

(২১শে মার্চ ১৯৫২)

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্যান্য প্রবন্ধের বই

তারুণ্য

আমরা

জীবনশিল্পী

ইশারা

বিনুর বই

জীয়নকাটি

দেশ কাল পাত্র

নতুন করে বাঁচা

প্রত্যয়